নারীর কথা

NARIR KATHA

The Hunger Project.
BANGLADESH

HELP FOUNDATION

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

নারীর কথা-১৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়

ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ ২০২৪

The Hunger Project. BANGLADESH

জাতীয় কন্যাশিশু অ্যাডভোকেসি ফোরাম
National Girl Child Advocacy Forum

নারীর কথা-১৯

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৪ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি

যুগ্ম সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা
শাহীনা আক্তার
অলিউল ইসলাম

প্রকাশকাল
৮ মার্চ ২০২৪

মুদ্রণে
ইনোসেন্ট
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

ISBN Number: 978-984-35-6272-2

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েব: www.thpbd.org; www.bikoshitonari.net
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh.

সম্পাদকীয়

কোনো একটি দেশের উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি কিংবা রূপান্তরের সঙ্গে তার সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হয়। সামাজিক উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হয় যখন সমাজের মানুষ ক্ষমতায়িত হয়, তাদের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়, সামাজিক পুঁজি তৈরি হয়। সামাজিক উন্নয়নের আরেকটি শর্ত হলো নারীর ক্ষমতায়ন। আর নারীর ক্ষমতায়নের প্রকাশ ঘটে মোটাদাগে নারীর রাজনীতি ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া অংশগ্রহণ, কর্মক্ষেত্র তথা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ, অবনমিত মাতৃমৃত্যু ও বাল্যবিবাহের হার দ্বারা।

আশার কথা হলো, বিগত কয়েক দশকে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে, যদিও প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অনুসর্গ হিসেবে এ সময় বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর জীবনমান উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ যে ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় এসডিজি অর্জনেও বিশেষ করে এসডিজির স্থানীয়করণে নারীরা রেখে চলেছেন অসামান্য ভূমিকা। নারীদের এ অগ্রগমনে অন্য আরও অনেকের সঙ্গে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিশ্বাস করে, নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি। নারীরা এগিয়ে এলে সমাজ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের পথ খুঁজে পাবে। 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত নারীনেত্রীগণ তৃণমূল পর্যায়ে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তার প্রমাণ রেখেছেন।

প্রসঙ্গত, নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিতকরণ ও তাদের নেতৃত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২০০৬ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে একদল নারীকে সংগঠিত, ক্ষমতায়িত ও জাগ্রত করার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠে 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক', যার মূল লক্ষ্য নারীরা যেন নিজেরাই সর্বক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের মূল রূপকার হয়ে ওঠতে পারে।

মূলত, উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের বলিষ্ঠ করে তোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। আমাদের প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে তৃণমূলে একদল রূপান্তরকারী নারী

নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের অনুঘট। একইসঙ্গে তারা নারীর প্রতি সহিংসতা ও চলমান বৈষম্য দূরীকরণে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে চলেছেন। এ গ্রন্থে প্রকাশিত গল্পগুলো তাদেরই প্রচেষ্টা ও সাফল্যের প্রামাণ্য দলিল।

'নারীর কথা' একটি ধারাবাহিক সংকলন। ২০০৬ সালে এর প্রথম সংকলনটি প্রকাশিত হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় সাফল্যের সোপান বেয়ে এবার তৃণমূলের ২৯ জন নারীনেত্রীর সফলতার গল্প নিয়ে প্রকাশিত হলো 'নারীর কথা-১৯'।

আমরা মনে করি, সফলতার এ গল্পগুলো পড়ে সমাজের অন্যসব নারীরা অনুপ্রেরণা পাবেন এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠবেন। নিজেরা সফল হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবেন এবং সমাজের উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখবেন। আর এর মাধ্যমে গড়ে ওঠবে নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ।

আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যারা নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে নারীদের এসকল সাফল্যগাঁথা সংগ্রহ করেছেন।

গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি।

নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে এ গল্পগুলো যদি অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে, তবে সেটিই হবে এ গ্রন্থের সাফল্য।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সূচিপত্র

নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করতে চান আছমা সুলতানা	৭	মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন
আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক মামিশ্বরের নাছিমা আক্তার	১০	সাফায়েত হোসেন
নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস জাহেদা আক্তার	১৪	সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন
শহুরে বদরুন নাহার কলি এখন গ্রামের অদম্য সমাজকর্মী	১৮	মাইনুল ইসলাম
অনিমা মজুমদার-এর পরিবর্তনের গল্প	২৩	মো. সাইফুল ইসলাম
নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে সফল বাবুগঞ্জের ফেরদৌসি জামান	২৩	সুষমা হালদার
সমাজ পরিবর্তনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পুতুল বেগম	২৮	মুহাম্মদ জাকির হোসাইন
দারিদ্র্য জয়ী এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী শিউলি বেগম	৩২	সিদ্দিকুর রহমান
নিপীড়িত মানুষের আপনজন আফরোজা আক্তার বানু	৩৪	মো. রোকনুজ্জামান
পিছিয়ে পড়া মানুষের আশার প্রতীক ভাবিরন নেছা	৩৭	মো. বাশারুল ইসলাম
মানুষের আপন মানুষ ফেরদৌসি খাতুন	৪০	মো. হেলাল উদ্দীন হাসান
শূন্য থেকে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী নূরজাহান	৪২	শ্রী সাধন কুমার দাশ
তাহমিনা খাতুন: বয়স যাকে বৃদ্ধ করেনি	৪৫	মো. আসাদুল ইসলাম
তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে সক্রিয় অচিন্তা দাশ	৪৮	সাধন কুমার দাশ
সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত নারীনেত্রী কহিনুর বেগম	৫১	মনিরুজ্জামান

নারী-পুরুষের সমতার সমাজ গড়তে চান ময়না বেগম	৫৬	মো. মেহেদী হাসান
সুস্থ-সুন্দর আগামী প্রজন্ম গড়তে চান আছিয়া	৫৯	মো. হুমায়ূন রশীদ জুয়েল
'জয়িতা' জয়ী আরজিনার সাফল্যগাঁথা	৬২	মো. মাহমুদ আলী
স্বাস্থ্য সচেনতা বৃদ্ধিতে 'পুষ্টি আপা' রিপার অনন্য ভূমিকা	৬৫	এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন
তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে নিবেদিত কণা আক্তার	৬৮	পলাশ কান্তি পাল
আত্মপ্রত্যয়ী সংগঠক মাসুদার সাফল্যগাঁথা	৭১	মো. হামিদুল ইসলাম
মিনু আক্তার: একজন দক্ষ সংগঠক ও সমাজকর্মীর প্রতিচ্ছবি	৭৫	মো. রেজাউল করিম
তৌফিকা বানু এখন প্রতিষ্ঠিত নারী	৭৯	মো. খোরশেদ আলম
নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণসঞ্চারী মানুষ 'খাদিজা আপা'	৮৩	অজিবর রহমান লেবু
প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে সফল নারীনেত্রী সন্ধ্যা রাণী সরকার	৮৬	চন্দ্রশেখর রায়
জীবনযুদ্ধে জয়ী উজ্জীবক তাহমিনা বেগম	৯১	মো. মোজাম্মেল হক
সমাজের আপন মানুষ ফারজানা আক্তার মিলি	৯৪	নেসার আমিন
বহু গুণের দিপু এখন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা	৯৯	নেসার আমিন

নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করতে চান আছমা সুলতানা

মোহাম্মদ রবিউল হোসাইন

১৯৯১ সালে ৫ মে। এদিন কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নের বেলঘর গ্রামে আব্দুর রহিম ও কামরুনাহারের কোলজুড়ে আসে ফুটফুটে এক কন্যাসন্তান। বাবা-মা আদর করে নাম রাখেন আছমা সুলতানা। পিতার পরম আদরের দ্বিতীয় মেয়ে আছমা।

অন্য সব সাধারণ পরিবারের মতোই শৈশবে হেসে-খেলে আছমার বেড়ে ওঠা। তার বাবা এক সময় চাকরি সূত্রে সপরিবারে থাকতেন বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে। সেই সূত্রে আছমার লেখাপড়া শুরু হয় বগুড়া ফুলকলি কিন্ডারগার্টেনের শিশু শ্রেণিতে। প্রথম শ্রেণিতে মেধা তালিকায় প্রথম হয়ে পুরস্কার জিতেন তিনি। কিন্তু সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্টনমেন্টে উচ্চ বিদ্যালয়ে। এখান থেকে প্রাথমিকের পাঠ শেষ করেন। হঠাৎ করে আছমার বাবা সপরিবারে নিজ গ্রামের বাড়ি চলে আসেন। ইতিমধ্যে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচজনে।

আছমাকে ভর্তি করানো হয় গ্রামের স্কুল বেলঘর গোসাই বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে। শুরু হয় অভাবের সঙ্গে সংগ্রামী জীবন। দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। ২০০৮ সালে মানবিক বিভাগ থেকে সাফল্যের সঙ্গে এসএসসি পাস করেন আছমা। অনেক সমস্যা থাকার পরও আছমা প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভর্তি হন নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজে। ২০১০ সালে এখান থেকে এইচএসসি পাস করেন তিনি। এরপর ডিগ্রিতে ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে। কিন্তু ডিগ্রিতে কিছুদিন পড়ার পর আর্থিক সংকটে লেখাপড়া স্থগিত হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকে কিছুদিন।

এরমধ্যে সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৯৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন আছমা সুলতানা। এই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি বুঝতে

পারেন নারীর ক্ষমতায়নে নারীদেরকেই প্রথমত এগিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ নিজের অবস্থার পরিবর্তনে আত্মোপলব্ধি ও সঠিক কর্মস্পৃহা প্রয়োজন। জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টিও তাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তিনি আগে ভাবতেন নারীদের দিয়ে তেমন কিছুই হবে না। নারীরা সবকিছুতে পিছিয়ে পড়া, নারীদের এত লেখাপড়া করে কী হবে? কোনো কাজেই নারীদের এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি বুঝতে শিখেছেন গুরুত্ব দেওয়ার মতো তাকে কিছু করতে হবে। মনে মনে তিনি অধিকার আদায়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই ধারাবাহিকতায় তিনি ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করেন, উপলব্ধি করেন নিজের ও সমাজের মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তনে অনেক কিছু করার আছে এবং করাটা তার দায়িত্বও।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের পর আছমা স্থানীয় নারীদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় কয়েকটি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তিনি নিজেও প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল হাঁস-মুরগি পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ ও ব্লক-বাটিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ইতিমধ্যে তার চাকরি হয় 'প্রগতী পাঠশালায়'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সৈয়দ ওমর আহমেদ। সৈয়দ ওমর অল্পসময়ে আছমা সুলতানার একজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলেন। আছমা তার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই তাকে অবহিত করেন। তিনি আছমাকে আবার লেখাপড়া শুরু করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। সৈয়দ ওমরের উৎসাহে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অনুপ্রেরণায় আছমা আবার লেখাপড়া শুরু করেন।

উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী আছমা সুলতানা

বর্তমানে আছমা প্রগতি পাঠশালার সহকারী শিক্ষক। পরিবারের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তার হাতেই পরিচালিত হয়। তার গোয়ালে গরু আছে চারটি, ছাগল আছে ছয়টি, হাঁস-মুরগি আছে প্রায় ত্রিশটি। বসতবাড়িতে সবজির চাষ করে

পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বাড়তি সবজি বাজারে বিক্রি করে আয় করেন আছমা। তার বাড়িতে পারিবারিক ফলজ বাগান রয়েছে। আছমা গাছগুলো যত্ন নেন। দেখা যায়, মৌসুমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফল বাজারে বিক্রি করা যায়। কিটনাশক ও পরমালিনমুক্ত হওয়ার কারণে মানুষ এসব ফল কিনতে আগ্রহ দেখায়।

ইতিমধ্যে আছমা বিএ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং পুনরায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজে এমএ-তে ভর্তি হয়েছেন।

নিজের জীবনের উন্নয়ন ছাড়াও আছমা একজন নারীনেত্রী হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। পিছিয়ে পড়া মানুষের মাঝে বিশেষ করে নারীদেরকে তিনি উৎসাহ যোগান এবং বলেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না এমনটা নয়, তুমিও পারবে, তোমাকে পারতে হবে'। আছমা সুলতানা আশেপাশের বিদ্যালয়ের ঝরেপড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামীকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। বছরের শুরুতে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তিতে তিনি সহযোগিতা করেন। এছাড়া পড়ালেখায় কিছুটা দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠদানও করেন তিনি।

নারী-পুরুষের সমতা আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আমাদের সমাজে। নারীর প্রতি বঞ্চনা-বৈষম্য আজও বিরাজমান। আছমা বিষয়টা মেনে নিতে পারেন না। তাই তিনি অন্যায্যতা ও বৈষম্য ভেঙে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন অসংখ্য। তিনি নিজে, কখনও অন্যদের সহয়তা নিয়ে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধ করেন।

নারীনেত্রী আছমা সুলতানা জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার মধ্যে যে আত্মোপলব্ধি ও দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি নারীদেরকে আরও ক্ষমতায়িত করতে চান। তিনি মনে করেন, এর মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাঝেই তিনি তার জীবনের স্বার্থকতা খুঁজে পাবেন।

আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক মামিশ্বরের নাছিমা আক্তার

সাফায়েত হোসেন

বাংলাদেশের নারীরা এখন পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি খাতেই অবদান রেখে চলেছেন। করপোরেট অফিস, কিংবা বেসরকারি সংস্থা– সব জায়গায় নারীর পদচারণ, কিংবা ক্ষমতায়নের ইতিবাচক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভাগীয় শহরগুলোতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর পদচারণা বাড়লেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর অবস্থা ও অবস্থানের এখনও আশানুরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার দিক থেকে গ্রামীণ নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে। বেশিরভাগ নারী স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে কিছু কিছু নারী সরকার ও বিভিন্ন এনজিও'র পৃষ্ঠপোষকতায় হস্তশিল্প, কৃষিকাজ ও সেলাই ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ পরিবারে অবদান রেখে চলেছেন। এই কিছু নারী– যারা নিজ কর্মপ্রচেষ্টায় নিজেকে সমাজে অন্যতম অংশীদারে পরিণত করেছেন তাদেরই একজন কুমিল্লার লাকসাম উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের মামিশ্বর গ্রামে সংগ্রামী নারী নাছিমা আক্তার।

নাছিমার জন্ম ১৯৭২ সালে, লাকসাম উপজেলার মিজিয়াপাড়া গ্রামে। তার জন্মের দু বছরের মাথায় মিজিয়া পাড়ার জায়গা-জমিন সব বিক্রি করে স্থায়ীভাবে মামিশ্বর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন নাছিমার বাবা।

নাছিমার বাবা মাস্টার হাবিবুর রহমান ছিলেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাইস্কুলের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক। আর মাতা মরিয়মের নেছা ছিলেন গৃহিণী। তিন বোনের মধ্যে নাছিমা ছিলেন সবার ছোট। নাছিমার বাবার কোন পুত্রসন্তান ছিল না বিধায় কন্যাদের তিনি খুব আদর-যত্ন করতেন। বিশেষ করে ছোট সন্তান হিসেবে নাছিমা ছিলেন সবার আদরের।

গ্রামের নির্মল ও উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠতে থাকেন নাছিমা আক্তার। শিক্ষাজীবন শুরু হয় চট্টগ্রামের টাইগার পাস আমবাগান স্কুলে। কিন্তু বাবা চট্টগ্রাম থেকে চলে আসায় ভর্তি হন আন্তাকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখান থেকে পাঠ শেষ করে

ভর্তি হন উত্তরদা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৮৫ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় মাত্র ১৩ বছর বয়সে একই গ্রামের বাসিন্দা একেএম সোলাইমান-এর সঙ্গে নাছিমা আক্তার-এর বিয়ে হয়ে যায়। একেএম সোলাইমান পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সংসারে এসে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-দেবরদের সঙ্গে ভালোই মানিয়ে নিয়েছিলেন নাছিমা। এছাড়া অল্প দিনের মধ্যে স্বামীর ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন তিনি। অসাধারণ মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন নাছিমার স্বামী সোলাইমান। তাই তিনি তার বাবা-মাকে বুঝিয়ে নাছিমার লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেন।

সংসার, আর লেখাপড়া– হাসি-আনন্দেই কেটে যায় তিন বছর। দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় নাছিমার প্রথম সন্তানের আগমন ঘটে পৃথিবীতে। সন্তানের আগমনে বন্ধ হয়ে যায় নাছিমার লেখাপড়া। অপার আকাঙ্ক্ষার মাতৃত্ব তার জন্য উৎসবের উপলক্ষ না হয়ে আসে আমানিশা হয়ে। কারণ হঠাৎ করেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি নাছিমার স্বামী এক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় স্বামী-সন্তানকে নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে কাটতে থাকে নাছিমার জীবন।

কী করবেন কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না নাছিমা। বেকার স্বামীর সংসারে আসে আরও দুই সন্তান। কিন্তু নাছিমা গ্রামের অন্য নারীদের মতোই ঘরের চার দেয়ালে বন্দি থাকেননি। স্বামীর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সংসারের খরচ যোগান দেওয়ার জন্য তিনি একটি বেসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্যসেবিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তার দায়িত্ব ছিল গর্ভবতী নারীদের টিকাদান ও তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও শিশুর পুষ্টি ইত্যাদি। এলাকার কেউ যাতে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া থেকে বাদ না পড়েন তাও নাছিমা নিশ্চিত করেন।

নারীদের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়। নারীদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনা তাকে হর-হামেশাই পীড়া দিত। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা তাকে ব্যথিত করে তুলত। এসময় নাছিমা বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়েও কথা বলতে শুরু করেন। নারীদের সঙ্গে তাদের অধিকার নিয়েও আলোচনা করেন। এসব করতে গিয়ে তিনি স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েন। এতে নাছিমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে নাছিমা ও তার স্বামী শ্বশুরবাড়ির সংসার থেকে আলাদা হয়ে যান। নাছিমার স্বামী একেএম সোলাইমান সবসময় নাছিমার সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাকে উৎসাহ দিতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝা-পড়ার কোনো অভাব ছিল না। স্বামীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় নাছিমার কাজের গতি আরও বেড়ে যায়। তিনি হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন এবং সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে সংসারের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

২০০১ সালে নাছিমা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (৭১তম ব্যাচ) অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণে আলোচিত আত্মশক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা তাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। নতুন পথের দিশা পান তিনি। প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের জন্য প্রচারাভিযান আয়োজন করেন এবং প্রচারাভিযানে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং শিশুদের বিদ্যালয়গামী করতে পাড়ার পাড়ায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন তিনি।

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী নাছিমা আক্তার

এসব কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে নাছিমার সম্পৃক্ততা ঘটে। নাছিমা তার গ্রামে ২০টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং নিরাপদ পানির জন্য ৮টি গভীর নলকূপ স্থাপনে মূল ভূমিকা পালন করেন। তিনি শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তার এলাকার ২১ জন ঝরেপড়া শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। তার এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এলাকার জনগণ তাকে স্থানীয় আতাকরা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদে নির্বাচন করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। জনগণের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে নাছিমা উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং সদস্য নির্বাচিত হন।

২০১৬ সালে নোয়াখালী এনআরডিএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২১৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন নাছিমা। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ তার জানার পরিধি ও অনুপ্রেরণা আরও বাড়িয়ে দেয়। নারীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য নাছিমা নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করেন। এলাকায় ফিরে নাছিমা স্থানীয় নারীদের সংগঠিত করতে থাকেন। ২১ জন

নারীকে নিয়ে গঠন করেন 'মামিশ্বর গণগবেষণা মহিলা সমবায় সমিতি'। নাছিমা এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে সমিতির মূলধন ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

অর্থনৈতিক মুক্তি ও সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি নাছিমা এলাকার নারীদেরকে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছেন। তিনি এ পর্যন্ত ৪০ জন শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, ২৫ জন গর্ভবতী নারীকে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও বিভিন্ন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে পেরেছেন। অসংখ্য নারীকে গর্ভকালীন পুষ্টি, আয়রন, ভিটামিন ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সচেতন করে তুলেছেন। ১৫ জন নারী ও ১০ জন পুরুষকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন তিনি। নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত নারীদের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ যোগান।

হাসপাতালে কর্মরত নারীনেত্রী নাছিমা আক্তার

সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কারণে উত্তরদা ইউনিয়ন পরিষদ নাছিমা আক্তারকে ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য মনোনীত করে।

কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) চলাকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে মাস্ক বিতরণ, স্যানিটাইজার, হাত ধোয়া, দূরত্ব বজায়, হাঁচি-কাশি-ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলেন এবং করোনার টিকা নেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহ যোগান এবং টিকার নিবন্ধন করতে সহায়তা করেন। নাছিমার এসব কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে লাকসাম সরকারি স্বাস্থ্য ক্লিনিক তাকে স্থায়ীভাবে হাসপাতালের টিকিট কালেক্টরের দায়িত্ব প্রদান করেছে। নাছিমা বর্তমানে এই চাকরিতে বহাল থেকে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন।

নাছিমা আক্তার বলেন, 'নিজে একা ভালোভাবে বেঁচে থাকার নাম নাম জীবন নয়। এলাকার সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে সুখে-দুঃখে চলাই সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা। তিনি মনে করেন, সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে।

নারীদের অনুপ্রেরণার উৎস জাহেদা আক্তার

সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

‘সমাজের মানুষ এখন আমাকে ইতিবাচকভাবে দেখে, অনেকে আমাকে ‘জনপ্রতিনিধি’ হিসেবে দেখতে চায়। তাই উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আমি নির্বাচনে প্রার্থী হব।’– কথাগুলো বলছিলেন কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার ঝলম উত্তর ইউনিয়নের হাড়িয়া হোসেনপুর গ্রামের নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার।

১৯৮৬ সাল। সুলতান আহমেদ ও সাফিয়া খাতুন দম্পতির কোলজুড়ে আসে তাদের তৃতীয় সন্তান। নাম রাখেন জাহেদা আক্তার। সুলতান আহমেদ নিজ গ্রাম বড়কেশতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণি একজন কর্মচারী। চার ছেলে ও তিন মেয়ে-সহ নয়জনের পরিবার চালাতে হিমশিম খেতেন তিনি। কিন্তু সন্তানদের লেখাপড়ার প্রতি ছিল বিপুল আগ্রহ। তাই তিনি অতি কষ্টে চালিয়ে যান সন্তানদের লেখাপড়া।

জাহেদারও ছিল লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিলেন। তিনি বড়কেশতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি ও বড়কেশতলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০৪ সালে এসএসসি পাস করেন। এখানেই থেমে যাননি তিনি। বরং লেখাপড়ার পাঠ চালিয়ে নিতে থাকেন।

বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ার কারণে জাহেদা ৬ হাজার ৮০০ টাকা বেতনে চাকরি নেন ব্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলে। চাকরির বেতন দিয়ে নিজে লেখাপড়া করেছেন এবং সহযোগিতা করেছেন বাবাকে। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি সহপাঠক্রমেও ছিলেন পারদর্শী। স্কুল জীবনে লম্বা লাফ, গোলক নিক্ষেপ, সুঁই খেলা, পাতিল ভাঙ্গা খেলায় পুরস্কার অর্জন করেন জাহেদা।

২০০৬ সালে জাহেদার বিয়ে হয় পাসের গ্রামের সিসিএন কলেজের প্যাথলজি বিভাগে অধ্যয়নরত জামাল হোসেনের সঙ্গে। বিয়ের পর জাহেদার লেখাপড়ার ব্যাপারে শ্বশুররবাড়ির লোকজন বিশেষ করে ভাসুর ও শ্বশুর বাধা হয়ে দাঁড়ান। কিন্তু স্বামীর আন্তরিক চাওয়া ও জাহেদার অনড় অবস্থানের কারণে জাহেদা নীলকান্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি ও বিএ পাস করেন।

২০১২ সালে চাকরিরত অবস্থায় উজ্জীবক ও নারীনেত্রী হোসনে আরার আমন্ত্রণে নোয়াখালী দত্তের হাটে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১১৭তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন জাহেদা। জাহেদা জানান, পুরো প্রশিক্ষণটি তার জন্য ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আলোচনাগুলো তার কাছে বেশ ভালো লাগে। প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে এসে জাহেদা নতুন করে শুরু করেন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। ২০১৬ সালে প্রকল্প শেষ হলে চলে যায় জাহেদার চাকরি।

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার

জাহেদা নেমে পড়েন জীবন সংগ্রামে। কী করে নিজের পরিবর্তন এবং আশপাশের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা যায়– সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকেন তিনি।

জাহেদার স্বামী একজন প্যাথলজিস্ট। চাকরির সুবাদে তিনি থাকেন কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায়। জাহেদা তার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে কৃষিকাজ এবং বাড়ির পাশে পতিত ভিটায় শাক-সবজি চাষ শুরু করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত জাহেদা কৃষিকাজ, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ও ছাগল পালনের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ৭ হাজার ৫০০ টাকা দিয় তিনটি ছাগল কিনে শুরু করেন ছাগল পালন। বর্তমানে এই খাতে তার পুঁজির পরিমাণ প্রায় এক লাখ টাকা। ছোট-বড় মিলে তার ১০টি ছাগল রয়েছে।

জাহেদা নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করেন, যেগুলোর বাজার মূল্য প্রায় ২২ হাজার। ২০২৩ সালে তিনি পারিবারিক ডিম ও মাংসের চাহিদা মিটিয়ে ৬ হাজার টাকার হাঁস-মুরগি এবং ২ হাজার টাকার ডিম বিক্রি করেন। জাহেদা নিজের

বসতভিটায় সবজি চাষ করে পরিবারের সকল চাহিদা মিটিয়ে ২ হাজার টাকার সবজি বিক্রি করেন। জাহেদাকে অনুকরণ করে তার প্রতিবেশীরা এখন বসতবাড়িতে সবজি চাষ, বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন, কবুতর পালন করে নিজেদের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

ছাগল পালন করছেন নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার

এর পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে মানুষকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন জাহেদা। তিনি গর্ভবতী নারীদের পরিচর্যা বিষয়ক ২৫টি উঠান বৈঠক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক ৩০টি উঠান বৈঠক, যৌতুক বিরোধী ১৫টি উঠান বৈঠক, মা ও শিশুর টিকা বিষয়ক ২০টি উঠান বেঠক, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে ১৬টি উঠান বৈঠক, বৃক্ষরোপণ বিষয়ক ২০টি উঠান বৈঠক এবং বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ বিষয়ক ২০টি উঠান বৈঠক আয়োজন করেছেন। এছাড়াও তিনি ২৫০ জন মা ও শিশুকে বিভিন্ন টিকা নিতে সহযোগিতা করেছেন। ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খেতে সহযোগিতা করেছেন প্রায় ১ হাজার শিশুকে, ১১৫ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সহযোগিতা করেছেন, ২৪ জন ঝরে পড়া শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করেছেন।

জাহেদা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাব্রতীরা হাড়িয়া হোসেনপুর উত্তর পাড়াকে বাল্যবিবাহ ও যৌতুকমুক্ত পাড়া হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাদের পাড়ায় এখন আর বাল্যবিবাহ ও যৌতুকে লেনদেন হয় না। জাহেদা নিজ উদ্যোগে দুটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

স্থানীয় নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে জাহেদা ‘জবা গণগবেষণা সমিতি’ নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির ২৬ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ সদস্য প্রতিমাসে ১০০ টাকা সমিতিতে সঞ্চয় করেন। সমিতির বর্তমান পুঁজি দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬০০ টাকা। পুঁজি ৫০ হাজার টাকা হলে বিনিয়োগ শুরু করা হবে।

জাহেদার তিন মেয়ে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। তিনি মেয়েদেরকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেন। তিনি তাদেরকে একেকজনকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান।

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করছেন নারীনেত্রী জাহেদা আক্তার

জাহেদা আক্তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও সমাজের পরিবর্তনে সদা নিয়োজিত থাকতে চান। তিনি শুধু নিজ পাড়া নয়, পুরো ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনমুক্ত দেখতে চান। এজন্য সাধ্যমতো কাজও করে চলেছেন তিনি। জাহেদা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে সহযোগিতা নিয়ে স্থানীয় নারীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির জন্য তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে চান।

"মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা, আর সমস্তই তার অধীন"
– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শহুরে বদরুন নাহার কলি এখন গ্রামের অদম্য সমাজকর্মী

মাইনুল ইসলাম

সত্যিকারের ভাবনার মাঝেই খোঁজে পেলাম যাকে তিনি হলেন বদরুন নাহার কলি। তিনি আর দশজন নারীর মতো গ্রামের পরিবেশে বেড়ে ওঠেননি। তিনি ছিলেন পুরোদস্তুর শহুরে মানুষ। কিন্তু সেই তিনিই এখন বসবাস করছেন বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে পর্যটন সমৃদ্ধ জেলা কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের পূর্ব কোনাখালী গ্রামে।

গ্রামে বাড়ি করলেও কলির বসবাসের বসতভিটা ও ঘরের মাঝে রয়েছে শহরের মতো সকল সুসজ্জিত ব্যবস্থা। যে পরিবেশে গেলে যে কারো মন ভরে ওঠবে। কলি আন্টি আমাকে (বর্তমান গল্পের লেখক) বেশ স্নেহ করেন। কারণ আমার ডাকনামে তাঁর একজন ভাগিনা আছেন। তাই আমিও কোনো কাজের সুবাদে দেখা হলে তাঁকে 'আন্টি' বলে সম্বোধন করি।

কোনো এক শীতের দুপুরে বসন্ত আগমনী রোদের মাখনিতে মেঠো পথে হেঁটে কলি আন্টির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বাড়িতে ঢোকা মাত্রই তাঁর হাতের স্পেশাল পুদিনা পাতার শরবতে চুমুক দিতে দিতে কথা বলা শুরু করি। ভিলেজ পলিটিক্স এবং মানুষের আচরণ নিয়ে বলতে থাকলেন তিনি। প্রসঙ্গ পাল্টে কলি আন্টি আমাকে নিজের জীবন সংগ্রামের কথা বলতে শুরু করলেন।

বদরুন নাহার কলির জন্ম ১৯৭৬ সালের ২৬ মার্চ, ঢাকার মিরপুরে। তাঁর বাবার নাম আব্দুর রকিব মৃধা, আর মায়ের নাম বেগম সামসুন্নাহার। চার বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে কলি সবার ছোট। বড়বোন কামরুন্নাহার বেগমের হাত ধরে ১৯৮১ সালে পড়ালেখার হাতেখড়ি হয় কলির। ১৯৯৪ সালে দেন এসএসসি পরীক্ষা। এরপর ১৯৯৬ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করলেও অল্প বয়সে, অপরিণত অবস্থায় ভালোবেসে বিবাহবন্ধনের আবদ্ধ হন কলি। বিয়ের এক বছর পর কলির কোলজোড়ে আসে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান। নাম রাখেন মেহের আফজান মেহেনাজ।

বিয়ের আগে স্বামীর সঙ্গে যে ভালোবাসা ও বিশ্বাস ছিল, বিয়ের পর সে ভালোবাসার আসল রূপ ফুটে ওঠতে শুরু হলো। কলির নিজের মতো করে চলাফেরার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ান তার স্বামী। স্বামীর সঙ্গে নানান বিষয়ে মতভেদ ও অসহিষ্ণু আচরণ তৈরি হয়। স্বামীর কিছু কিছু আচরণে ছিল নীতিহীনতা। এই মতানৈক্যের মাঝে কলি কুমিল্লা ইপিজেডে একটি কোম্পানির সিনিয়র অফিসার হিসেবে পদে যোগ করেন। স্বামীর সংসার ও চাকরির পাশাপাশি কলি নিজেকে গড়ে তুলতে আবুজর গিফারী কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। চাকরি করা ও লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ২০০৯ সালে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় কলির। পরে কাজের সুবাদে পরিচয় হয় সিএনএফ ব্যবসায়ী কোনাখালীর জাহেদ উদ্দিন চৌধুরীর

ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালায় নারীনেত্রী বদরুন নাহার কলি

জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী সিএনএফের ব্যবসায়িক কাজে ঢাকায় গেলে দেখা হয় ব্রিটিশ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জেনারেল ম্যানেজার কলির সঙ্গে। তখন জাহেদ চৌধুরী তাঁর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর দুই কন্যা ও এক ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। জাহেদ উদ্দিন চৌধুরী কলির মতো একজন প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী মায়ের খোঁজ করছিলেন। কলি তাঁর মেয়ে মেহের আফজান মেহেনাজ-এর সম্মতিতে ২০১৫ সালে বিয়ে করেন জাহেদ উদ্দিন চৌধুরীকে।

দ্বিতীয় বিয়ের পর তিনি ঢাকায় বসবাস শুরু করেন দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে। মেয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য নিয়ে কলি নিজ মেয়েকে রাখেন ঢাকায় বড়বোনের কাছে। মেয়ে এখন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে লেখাপড়া করছে।

২০১৮ সালেই কলির স্পৃহা তৈরি হয় ঢাকায় নয়, এখন থেকে গ্রামেই গিয়ে মানুষের

জন্য কিছু করতে হবে। তিনি সবসময় স্বামীর কাছেই শুনতেন গ্রামের মানুষ মানসিকভাবে নানা গোড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাছাড়া বিরূপ আবহাওয়ার কারণে মাঝে মধ্যেই নেমে আসে আইলা কিংবা হামুনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের সঙ্গেই যুদ্ধ করে বাঁচতে হয় এখানকার মানুষকে। কিন্তু অনেক কষ্ট আর সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে যারা খুঁজে নেন নিজেদের সফলতার পথ, কোনো প্রতিকূল শক্তিই তাদের পথচলা রুখতে পারে না। নদীর স্রোতধারার মতো তারা জীবনের সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যান সম্মুখপানে। এই অঞ্চলে আরও একটি সবচেয়ে সমস্যা হলো সমাজে নারীদের প্রতি ভিন্নদৃষ্টি।

নারীর প্রতি এধরনের অন্যায্য আচরণ বদলাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন কলি। আর তার মধ্যে সেই স্পৃহা তৈরি করে এবং তার মানসিকতার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে ২০১৯ সালে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। সমাজ পরিবর্তনের কলির সদিচ্ছা দেখে গ্রামবাসী তাঁকে পূর্ব কোনাখালী গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি নির্বাচিত করেন।

অসহায় মানুষের মাঝে নারীনেত্রী বদরুন নাহার কলি

কলি জানান, ২০২০ সালের শুরুতে শুরু হয় বৈশ্বিক করোনা মহামারি। এরপর করোনার ভয়াবহতা থেকে নিজ গ্রামের নারী ও শিশুদের রক্ষা করা জন্য সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান জানানো এবং মানুষকে হাত ধোয়ার নিয়ম শেখানোর জন্য নেমে পড়েন কোনাখালী ইউনিয়নে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময়ে অন্তত ৫০টি পরিবারের নারীদের মাঝে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে কীভাবে জীবাণুনাশক তৈরি করা যা সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় প্রায় ৫০০ পরিবারের সদস্যদের মাঝে মাস্ক বিতরণ, করোনায় পুষ্টিকর খাবারের যোগান সহজতর করার জন্য দশ ধরনের শাক-সবজি বীজ ১০০টি পরিবারের মাঝে বিতরণ করেন তিনি। গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ গুজবে আচ্ছন্ন হয়ে করোনার টিকা নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কলি। তিনি প্রায় পাঁচশত মানুষকে করোনার টিকা রেজিস্ট্রেশন করা এবং টিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

করোনা মহামারির তীব্রতা কমে আসার পর অন্যান্য সামাজিক কাজে যুক্ত হন কলি। তিনি কোনাখালী এলাকায় দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি

গর্ভবতী নারীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও মাতৃকালীন নিরাপদ মাতৃত্ব প্রদান এবং নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০টিরও অধিক শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহযোগিতা করেছেন, ঝরে পড়া ৩০ জন শিক্ষার্থীকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করেছেন, বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, ১৭ জন গর্ভবতী নারীর নিরাপদ সন্তান প্রসবে সহযোগিতা করেছেন। এর পাশাপাশি যৌতুক প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছেন তিনি। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পাক্ষিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের মাঝে আশার আলো প্রজ্জ্বলন করেছেন তিনি। গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের অনেক মেয়ে – যৌতুক দিতে না পারার কারণে যাদের বিয়ে হচ্ছিল না – এরকম ২৫ জন নারীকে তিনি বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ শিখিয়েছেন। পরবর্তীতে দক্ষতার কারণে যৌতুক ছাড়াই এসব নারীদের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কলির অন্যান্য সামাজিক কাজের মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রশিক্ষকের মাধ্যমে নারীদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ, হাঁস-মুরগি লালন-পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বসত বাড়ির পাশে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন, নারীদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ, অসহায় মানুষকে টিন পেতে সহায়তা করা, দু’জন পালিয়ে যাওয়া কন্যাশিশুকে তাদের বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা, তালাকপ্রাপ্তা নারীর কাবিনের টাকা ও আসবাবপত্র উদ্ধারে সহায়তা এবং তাদেরকে আবার ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

জয়িতা পুরস্কার গ্রহণ করছেন নারীনেত্রী বদরুন নাহার কলি

কলি বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের আইনি সহায়ত প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিতদের স্বাস্থ্যসেবা পেতে সহায়তা করছেন। সমাজ

উন্নয়নমূলক কাজে কলিকে সহযোগিতা করছেন তার বর্তমান স্বামী, দীর্ঘদিনের সাথী ও বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর নারীনেত্রী ও ভিডিটির সদস্যগণ। সামাজিক কাজের কারণে উপজেলায় অন্য নারীদের কাছে কলি হয়ে ওঠছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল কলি বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে কলি ২৪৭তম ব্যাচে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণে অংশ নেন। কলির মতে, নারীর পরিপূর্ণ নেতৃত্ব বিকাশে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণটি অন্যতম শিক্ষণ মাধ্যম। প্রশিক্ষণের পর সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে কলি নিজেকে আরও বেশি নিবেদিত করেন। এ কাজে তার উৎসাহ বাড়িয়ে দেন জয়িতা পুরস্কার। কলি ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় চকরিয়া উপজেলায় 'সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন যে নারী' ক্যাটাগরিতে জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন।

বদরুন নাহার কলি এখন অনেকটাই সফল ও দক্ষ একজন সমাজ উন্নয়নকর্মী। তার স্বামীর সিএনএফ ব্যবসার আয়ে ভালোই চলে তাদের সংসার। বদরুন নাহার কলি বিশ্বাস করেন, হিংসা ও বৈষম্য সমাজকে পিছিয়ে দেয়, তৈরি করে নানান প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সমাজে আনে শন্তিময় পরিবেশ, যার ফলে এগিয়ে পুরুষ, এগিয়ে যায় নারী।

> "তোমাদের কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।"
>
> *– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত*

অনিমা মজুমদার-এর পরিবর্তনের গল্প

মো. সাইফুল ইসলাম

প্রকৃতিগতভাবে নদী বিধৌত বরিশালের মাটি অত্যন্ত উর্বর। বাংলার শস্য ভাণ্ডার হিসেবে বরিশালের খ্যাতি বহু দিনের। বরিশালের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আগৈলঝাড়া উপজেলার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন বহু গুণীজন। তাঁদের কয়েকজন হলেন ভেগাই হালদার, শ্রীমতি, নিরঞ্জন বৈরাগী, কবি বিজয় গুপ্ত প্রমুখ। এই উপজেলার রাজিহার ইউনিয়নের বাটরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুণী মানুষ প্রেমচাঁদ। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাটরা প্রেমচাঁদ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে বাটরা গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষার কোনো আলো ছিল না। এই বাটরা গ্রামের এক বলিষ্ঠ উজ্জীবক ও নারীনেত্রী অনিমা মজুমদার।

অনিমা মজুমদার-এর জন্ম ১৯৮২ সালের ১০ মে, বাটরা গ্রামেই এক নিতান্ত দরিদ্র পরিবারে। তার বাবার নাম ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার, আর মায়ের নাম রেভা রাণী মজুমদার। অনিমারা মোট তিন বোন ও দুই ভাই। তাদের জায়গা-জমি বলতে তেমন কিছুই ছিল না। আছে শুধু মাথা গুজবার একটুকু ঠাঁই। পাঁচ সন্তানের লেখাপড়ার খরচ ও সংসারের ভরণ-পোষণ মেটাতে অনিমার বাবার অনেক কষ্ট হতো।

প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে অনিমা ভর্তি হন বাটরা প্রেমচাঁদ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯৫ সালে নবম শ্রেণিতে ওঠেন তিনি। পরিবারের অভাব-অনটনের মধ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যান অনিমা। ১৯৯৭ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করে তিনি। এরপর লেখাপড়ার সুযোগ পাননি তিনি। ১৯৯৯ সালে পারিবারিক সিদ্ধান্তে একই গ্রামের মনোতোষ হালদারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বাবার মতো স্বামীর সংসারে এসেও সেই একই দারিদ্র্যের দেখা পান অনিমা। অনিমার স্বামী একার আয়ে সংসারের খরচ যোগানো সম্ভব হচ্ছিল না। আর্থিক সংকট মেটাতে অনিমা গ্রামের মানুষের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করা শুরু করেন।

২০০৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন অনিমা মজুমদার। ‘আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না’– এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন তিনি। অনিমা উপলব্ধি করেন, নিজেকে ভালো রাখতে হবে। পাশাপাশি

এলাকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করতেও আমরা সকলে দায়বদ্ধ।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর এলাকায় ফিরে প্রথমে আত্মকর্মসংস্থান গড়ে তোলা, অর্থাৎ সংসারের আয় বাড়ানোর দিকে নজর দেন অনিমা। তিনি নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ শুরু করেন।

২০১৮ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন অনিমা। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হন। তার মতো অন্য মেয়েদের বাল্যবিবাহের শিকার হতে না হয়, সেজন্য তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক আয়োজন করে স্থানীয় কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। তাদেরকে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা, তাদের টিকা নিশ্চিত করা ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

স্থানীয় নারীদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী অনিমা মজুমদার

তিনি মূলত স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যকর্মীর সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে স্থানীয় গর্ভবতী নারীদের সেবা প্রদান করছেন। এছাড়া গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের একত্রিত করে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তোলেন। বর্তমানে এই সমিতিতে ৩২ জন সদস্য রয়েছে। সমিতির মোট সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৮৪ হাজার টাকা। এসব কাজের কারণে সামাজিকভাবেও তার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে।

নানাবিধ উপার্জনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার কারণে অনিমার সংসারে এসেছে স্বাবলম্বিতা। নিজের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করেছেন।

নারীনেত্রী অনিমা মজুমদার মনে করেন, মানুষ চাইলে তার অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারে। আর এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে।

নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে সফল বাবুগঞ্জের ফেরদৌসি জামান

সুষমা হালদার

জয়িতা পুরস্কার হাতে নারীনেত্রী ফেরদৌসি জামান

'স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।' ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং দেশটির সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালামের বিখ্যাত এক উক্তি এটি। এ কথাটিই যেন বাস্তবে ধারণ করলেন ৪৪ বছর বয়সী অদম্য নারীনেত্রী

ফেরদৌসি জামান ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মৃত আবুয়াল হোসেন (নামটা কি আবুল নাকি আবুয়াল), আর মায়ের নাম ফরিদা বেগম। ফেরদৌসির বর্তমান ঠিকানা বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের ০১নং ওয়ার্ডের মানিককাঠী গ্রামে। তার পরিবারে সদস্য সংখ্যা মোট পাঁচজন। দুই কন্যা, এক পুত্র ও স্বামী নিয়ে তার সুখের সংসার। বড় কন্যা সরকারি বিএম কলেজে বাংলা বিভাগে স্নাতক তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত, দ্বিতীয় মেয়ে সরকারি বিএম কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী, আর ছেলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। ফেরদৌসির স্বামী সাইফুজ্জামান ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন।

ফেরদৌসি শেরে বাংলা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং সরকারি ব্রজমোহন কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেও শেষ করতে পারেননি। কারণ এর মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে যায়।

বিয়ের পর ফেরদৌসিকে লেখাপড়াটা যেমন ছাড়তে হয়, তেমনই তাকে ছাড়তে হয় তার প্রিয় বই পড়ার অভ্যাস-সহ আরও কিছু শখ ও পছন্দ। পারিবারিকভাবে বিয়ে হলেও গায়ের রং ফর্সা না হওয়ার হওয়ার এ নিয়ে শশুরবাড়িতে তাকে কটাক্ষের শিকার হতে হয় দিনের পর দিন। এতে ফেরদৌসির ওপর তৈরি হয় মানসিক চাপ। এরপর সমস্যা আরও বেড়ে যায় যখন তার সংসারে আসে প্রথম কন্যাসন্তান। কন্যাসন্তান জন্মদানের কারণে তাকে নানাভাবে অপমান ও অপদস্ত করা হতো।

বাড়ির আঙ্গিনায় সবজির চাষ করছেন নারীনেত্রী ফেরদৌসি জামান

এ রকম একটি অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ান ফেরদৌসি জামান। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মকর্তা উত্তম কুমার-এর আমন্ত্রণে ২০১২ সালে তিনি 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণে তিনি নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুধামুক্তির আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো গভীরভাবে জানা ও উপলব্ধি করার সুযোগ পান। ফেরদৌসি উপলব্ধি করেন যে, তার মতো আরও অনেক নারীই বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অপমানিত ও অবহেলিত হচ্ছে। তিনি নারীর প্রতি এমন অন্যায্য আচরণ হ্রাসে ভূমিকা রাখার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের পর থেকে ফেরদৌসি বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। যেমন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তোলা, বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি। প্রতিবেশীদের কটাক্ষ কথা উপেক্ষা করে ফেরদৌসি তার মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। তার মেয়ের একজন ইয়ুথ লিডার হিসেবে গড়ে ওঠেছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি মা ও অন্য ইয়ুথ লিডারদের সঙ্গে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে।

নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি লালন-পালন করছেন নারীনেত্রী ফেরদৌসি জামান

সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি ফেরদৌসি নিজ বাড়িতে হাঁস-মুরগি লালন-পালন, ছাদ কৃষি, মাছ চাষ, সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদি করে চলেছেন। এ কারণে তার সংসারে এসেছে স্বচ্ছলতা।

ফেরদৌসি ২০২৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' শীর্ষক কার্যক্রমের আওতায় বাবুগঞ্জ উপজেলায় 'নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী– এই ক্যাটাগরিতে জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন।

জয়িতা পুরস্কার পাওয়ার কারণে অনুপ্রেরণা বেড়েছে ফেরদৌসি জামানের। তবে এতেই তিনি তৃপ্ত নন। সংসারের কাজের পাশাপাশি নব উদ্যমে তিনি শুরু করেছেন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ, অবহেলিত নারীদের এগিয়ে নেওয়ার কাজ। কারণ তিনি যে এখন একজন দক্ষ নারীনেত্রী, একজন দক্ষ মা, একজন দক্ষ সমাজকর্মী।

সমাজ পরিবর্তনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত পুতুল বেগম

মুহাম্মদ জাকির হোসাইন

ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার কেওড়া ইউনিয়ন একটি জনবহুল এবং সুপরিচিত নাম। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ জেলার বিখ্যাত লোকজনের বাসস্থান এখানে। এই ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মহৎপুর গ্রামের এক আলোকিত নারীনেত্রী পুতুল বেগম, যিনি নিজের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে না রেখে সমাজসেবায় রয়েছেন সদা নিবেদিত।

১৯৮১ সাল। বেল্লাল হোসেন ও হালিমা বেগমের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় এক কন্যাশিশু। বাবা-মা আদর করে নাম দেন পুতুল বেগম। ডাকেন পুতুল নামে। বাবা-মায়ের আদর, স্নেহ ও মমতায় নিরাপদেই কাটে পুতুলের শৈশবকাল।

নব্বইয়ের দশকে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকরা ছিলেন উদাসীন। তাই বেশিদূর লেখাপড়ার সুযোগ পাননি পুতুল। ১৯৯৯ সালে তারুলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় পিতা-মাতার পছন্দে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যায় পুতুলের। পাত্র একই ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের উত্তর পিপলিতা গ্রামের মো. আল-আমিন তালুকদার।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে ভালোই দিন কাটতে থাকে পুতুলের। কিন্তু বিয়ের দু বছর পর পুতুলের বাবা মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে পুতুল ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবার মৃত্যুতে সংসারে একা হয়ে তার মা। তাই মায়ের একাকিত্ব দূর করা এবং বাবার জমিজমা দেখাশুনার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে পুতুল তার স্বামীকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন।

সময়ের ধারাবাহিকতায় পুতুল এক ছেলে ও এক মেয়ের মা হন। বাড়তে থাকে সংসারের খরচ। বাবার বাড়িতে থাকার কারণে পুতুল সংসারের আর্থিক সমস্যার কথা স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে মুখ খুলে বলতে পারতেন না। ফলে সন্তানদের নিয়ে চরম দুর্দশায় জীবন কাটাতে হয় পুতুলকে। জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠতে শুরু হয় তার সংগ্রামী জীবন। এ সময় সংসার চালাতে কি না করেছেন তিনি! স্বামীর সামান্য রোজগার দিয়ে একইসঙ্গে পুতুলের পরিবার ও তার শ্বশুরবাড়ির

পরিবারের খরচ নির্বাহ করা যেত না। কখন কখনও পুতুল বেগম যখন যে কাজ পেতেন সামান্য অর্থের বিনিময়ে সে কাজই করতেন তিনি।

পুতুল আয় বাড়ানোর জন্য একটি সেলাই মেশিন কিনে বাড়িতে বসে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ কাজ করে তার তেমন কোনো আয় হতো না। তাই নতুন করে আর কী করা এ নিয়ে দোটানায় পড়ে যান পুতুল।

২০১৪ সালে স্থানীয় ইউপি সদস্য জাহানারা বেগম পুতুলকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে পুতুল ভাবেন কী হবে এই প্রশিক্ষন নিয়ে! কিন্তু প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার পর আত্মশক্তি বৃদ্ধির আলোচনা এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নারীর পশ্চাৎপদতাই দায়ী– এমন আলোচনা তাকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি যেন নুতন পথের দিশা পান।

শুরু হলো নিজেকে এবং সমাজকে পাল্টাবার পালা। এলাকার নারীদের সংগঠিত করে ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা এবং মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি নিজ ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি পাড়ায় উঠান বৈঠক ও কর্মশালা আয়োজন করেন। আগে কখনও এলাকায় নারীদের সঙ্গে তার এভাবে মেশার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পুতুল বিপদে-আপদে নারীদের পাশে দাঁড়ান। এলাকার নারীরাও মনের কথা বলার একটি নিরাপদ স্থান খুঁজে পান। সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ফলে পুতুলের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজেকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। শুরু হয় নতুন পথচলা।

স্থানীয় নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন নারীনেত্রী

২০১৬ সালে পুতুল কিছু অর্থ সঞ্চয় করে তারুলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন বাজারে একটি দোকানঘর ভাড়া নেন এবং সেখানে কাপড় সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। প্রথমদিকে আয় কম থাকলেও আজ আর সে অবস্থা নেই। অথচ মেয়েমানুষ আবার

দোকানে বসবে– এমন কত ভর্ৎসনাই সইতে হয়েছে পুতুলকে। কিন্তু প্রবল আত্মবিশ্বাসী পুতুল সমালোচনাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে শুরু করেন। তারুলী বাজারে পুতুলের অবস্থান তাকে সামাজিকভাবে এতটাই সুদৃঢ় করেছে যে না দেখলে ভাবাই যায় না। আজ আর পুতুলের দৈন্যতা নেই। আজ শুধু সাফল্যে ভরা জীবন। যে পুতুলের মাসে একটি টাকাও আয় ছিল না, এখন বিভিন্ন নামী-দামি প্রতিষ্ঠানের পোশাক এবং গ্রামের মানুষের পোশাক সেলাই করে প্রতিমাসে ১২-১৮ হাজার আয় করেন।

আজ তারুলী গ্রামের অসহায় মানুষজন পোশাক তৈরি করা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতে ছুটে আসেন পুতুলের কাছে। অনেক পরিবারের কাছে পুতুল এখন শুধু একটি নাম নয়, অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের নাম। প্রথমে সমাজের প্রভাবশালীরা যখন তাকে সহযোগিতা না করে সামাজিক বিধি-নিষেধ এবং একগুচ্ছ তাচ্ছিল্য দিয়েছিল সে সমাজ আজ পুতুল বেগমকে দিয়েছে সম্মানের আসন। অবশ্যই সেজন্য প্রায় এক দশক সমাজের সকল বাস্তবতাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হয়েছে পুতুলকে।

সমাজে বোঝা না হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে নিজ অবস্থান শক্ত করেছেন পুতুল। নিজে ব্যবসা করে চলেছেন এবং তারুলী বাজারের অন্য দশজন ব্যবসায়ীকেও সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এখন আর পিছনে ফেরার অবস্থা নেই। এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়।

২০২৩ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন পুতুল। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে আরও বেশি কাজ করা, বিশেষ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে সহায়তা করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

আমাদের বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিবার ও সমাজে নারীরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাত এ নির্যাতনের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে কয়েকগুণ। তাই আমাদের সমাজের নারীরা যদি পুতুলের মতো নব উদ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠতে পারে, তাহলে সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠায় আবারও বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরী হিসেবে প্রত্যেক ঘরে জন্ম নেবে একেকজন সফল আদর্শ নারী। পুতুল বেগম-এর সংগ্রামী জীবন সে ধরনের সফল নারী তৈরিতে হতে পারে এক অনুকরণীয় আদর্শ।

দারিদ্র্য জয়ী এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী শিউলি বেগম

সিদ্দিকুর রহমান

পৃথিবীতে মহৎ কিছু করতে চাইলে বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। এরকম অনেক ঘটনা সদাই আমরা শুনি, কিংবা ঘটে আমাদের চোখের সামনেই। আর সে কারণে সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণাসহ সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে নিজের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিতে প্রয়োজন দৃঢ় মনোবল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। আর এই শক্তিকেই কাজে লাগিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছেন আত্মপ্রত্যয়ী নারীনেত্রী শিউলি বেগম।

শিউলি বেগমের জন্ম ১৯৯২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের জাহাপুর গ্রামে। তার বাবার নাম সান্টু প্যাদা, আর মায়ের নাম রহিমা বেগম। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে শিউলি বেগম সবার বড়। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান হওয়ায় বাল্যকাল থেকেই আদর-যত্নে ও স্বাচ্ছন্দেই কেটেছে শিউলির শৈশবকাল।

সেলাই মেশিনে কাজ করছেন নারীনেত্রী শিউলি বেগম

১৯৯৯ সালে জাহাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি হয় শিউলির। প্রাথমিকের গণ্ডি শেষ করে ২০০৫ সালে ভর্তি হন জাহাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। পাঁচ সন্তান-সহ সাত সদস্যের পরিবারে ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে হয় বাবা সান্টু প্যাদাকে। সন্তানদের লেখাপড়ার খরচের ভার যোগাতে ব্যর্থ হন তিনি। এ কারণে ২০০৮ সালে নবম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় শিউলি বেগমের। পাত্র একই গ্রামের মো. শওকত আলী বেপারী।

সান্টু প্যাদা নিরক্ষর মানুষ ছিলেন, মাঠে-ঘাটে কাজ করে সংসার চালাতেন। অন্যদিকে যৌতুকের দাবিতে শিউলির ওপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তারপরও গ্রামের সহজ-সরল অবলা মেয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে যেতে চাননি। বছর দুয়েক পর শিউলির কোলজুড়ে আসে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান। কিন্তু তারপরও নির্যাতন কমেনি একটুও। বরং নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। মেয়ের মুখপানে চেয়ে শত কষ্ট, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করে সংসার করেন শিউলি বেগম। এভাবে দুঃখ ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে শত শত দিন কেটে যায় শিউলির।

এক রাতে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছেন শিউলি। হঠাৎ শিউলির স্বামী যৌতুকের টাকার জন্য তাকে মারধর শুরু করে এবং ঘরের খুঁটির সঙ্গে শিউলির হাত-পা বেধে রাখে পাষণ্ড স্বামী। মায়ের এ দুর্দশা দেখে চিৎকার করে ওঠে তার মেয়ে। তখন প্রতিবেশীরা শিউলিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে। এরপর শিউলি তার মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে আসেন, স্বামীর সংসারে আর না ফেরার উদ্দেশ্যে। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরামর্শে স্বামীর সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন শিউলি।

বাবার অভাবের সংসারে এসে মেয়েকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন শিউলি বেগম। অন্যদিকে পাড়া-পড়শী ও মানুষের কু-কথায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। নিষ্পাপ শিশু নিয়ে তার জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ।

নিজের ভ্যারাইটি স্টোরে ব্যস্ত উজ্জীবক ও নারীনেত্রী শিউলি বেগম

এমতাবস্থায় ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. সিদ্দিকুর রহমানের (বর্তমান গল্পের লেখক) সঙ্গে শিউলির দেখা হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাত হতে শিউলি বেগমকে মুক্তির দিশা দেখানোর জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একটি প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান সিদ্দিকুর রহমান। সিদ্দিকের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেন শিউলি বেগম। এর কিছুদিন পর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রশিক্ষণ দুটি শিউলির জীবনের নিভু নিভু প্রদীপটাকে নতুনভাবে জ্বালিয়ে রাখার প্রেরণা জোগায়। শুরু হয় তার নতুন জীবন। সমাজের নানান বাধা উপেক্ষা করে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন তিনি।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশের ইতিবাচক পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও নারীর উন্নয়নের জন্য কাজ করা শুরু করেন শিউলি। এ লক্ষ্যে তিনি সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, নির্যাতিত, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। তবে প্রথমে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার পরিকল্পনা নেন তিনি।

২০১৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক একটি প্রশিক্ষণে (দর্জি বিজ্ঞান) অংশ নেন শিউলি। প্রশিক্ষণ শেষে উপার্জন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন তিনি। প্রথমদিকে আয় কম থাকলেও সেলাইয়ের কাজ করে শিউলি বর্তমানে প্রতিমাসে গড়ে আট হাজার টাকা আয় করেন। এছাড়া শিলন্দিয়া বাজারে 'শিউলি ভ্যারাইটিজ স্টোর' নামে একটি দোকান রয়েছে তার। এই অর্থ দিয়ে তিনি মেয়ের লেখাপড়ার খরচ যোগান দেওয়ার পাশাপাশি বাবার সংসারেও সহযোগিতা করেন। শুধু তাই নয়, গোল্ডেন লাইফ ইন্সুরেন্স-এর উপজেলা সমন্বয়কারী হিসেবেও কাজ করছেন শিউলি।

গোল্ডেন লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির অফিসে কর্মরত উজ্জীবক ও নারীনেত্রী শিউলি বেগম

শত প্রতিকূলতার মাঝেও শিউলি সামান্যতম বিচলিত হননি। স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং একজন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তিনি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রেখেছেন। তিনি পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, মাদক, বৃক্ষ নিধন ও শিশুশ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করছেন।

শিউলি ২০২০ সালে জুন মাসে ২০ জন সদস্য নিয়ে 'জাহাপুর বহুমুখী সমবায় সমিতি' নামে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলেছেন। সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে একশত টাকা করে জমা রাখেন। বর্তমানে সমিতির সঞ্চয় দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। সমিতির নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে।

নারীনেত্রী শিউলি জানান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট তার অনুপ্রেরণা, তার নতুন করে ভাবতে শেখার অবলম্বন। আজ তিনি বিশ্বাস করেন, 'একটি আলোর কণা পেলে লক্ষ প্রদীপ জ্বলে, একটি মানুষ মানুষ হলে বিশ্ব জগত টলে।'

নিপীড়িত মানুষের আপনজন আফরোজা আক্তার বানু

মো. রোকনুজ্জামান

প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নিজের মতো করে নিজের জীবন গড়ে তুলেছেন নারীনেত্রী মোছা. আফরোজা আক্তার বানু। একদিকে তিনি যেমন নিজের জীবনে অর্থনৈতিক মুক্তি আর সামাজিক মর্যাদা বয়ে এনেছেন, একইসঙ্গে তিনি গ্রামের অবহেলিত নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য সামাজিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আফরোজার জন্ম ১৯৭৬ সালের ২০ জুন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথরাপুর ইউনিয়ন ফারাকপুর গ্রামের এক স্বচ্ছল পরিবারে। বাবা প্রকৌশলী মো. আনসারুল হক, আর মা গৃহিণী মোছা. সানোয়ারা বেগম। পাঁচ বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে আফরোজা দ্বিতীয়।

শৈশবে হাসি-খুশি স্বভাবের আফরোজা ছিলেন মা-বাবার আদরের সন্তান। তার লেখাপড়া শুরু হয় নিকটবর্তী শহীদ রফিক নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মেধাবি ছাত্রী ছিলেন আফরোজা। প্রাথমিকে ট্যালেন্টফুলে বৃত্তি পান। প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে আফরোজা তারাগুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভর্তি হন। ১৯৯৩ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন। এরপর দৌলতপুর ডিগ্রি কলেজ ভর্তি হয়ে ১৯৯৫ সালে এইচএসসি পাস করেন। এবারও প্রথম বিভাগে পাস করেন তিনি। এরপর একই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন আফরোজা।

ভালো ও মেধাবী ছাত্রী হওয়ার কারণে কলেজে শিক্ষকতা করার স্বপ্ন ছিল তার। কিন্তু লেখাপড়া শেষ হওয়ার আসে নানান প্রতিবন্ধকতা। যেহেতু বোনদের মধ্যে আফরোজা সবার বড়, তাই চাচা-চাচী সকলে বলাবলি শুরু করে, 'মেয়ে মানুষ, এত লেখাপড়া করালে পরে পাঁচ মেয়েকে বিয়ে দিবে কীভাবে?' তাই আফরোজ কে মাস্টার্সে ভর্তি না করিয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আফরোজা তার স্বপ্ন পূরণের জন্য চাকরি করতে দেওয়ার শর্তে বিয়ে করতে রাজি হন।

যথারীতি আফরোজার বিয়ে হয় মেহেরপুর জেলা গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মো. শফিকুল ইসলামের সঙ্গে। শফিকুল পেশায় একজন মাদরাসা শিক্ষক। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়।

আফরোজার প্রবল ইচ্ছা শিক্ষকতা করা। তাই বিয়ের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষতা শুরু করেন তিনি। কিন্ত এমপিওভুক্তি না হওয়ার কারণে তাকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় অনেকেই তাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। কিন্তু আফরোজা শিক্ষকতা পেশায় লেগে থাকেন। অবশেষে ২০১৩ সালে চাকরি শুরুর দীর্ঘ দশ বছর পর থেকে তিনি বেতন পাওয়া শুরু করেন।

২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত তিনদিনব্যাপী ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৭১তম ব্যাচ) অংশ নেন আফরোজা। এই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী আফরোজা আক্তার বান

আফরোজার উপলব্ধি হয়, জীবনে নানান প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। কিন্তু নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা এবং সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে চলার নামই জীবন।

প্রশিক্ষণে পর আফরোজা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অভাব-অনটন ও তাদের মানবেতর জীবনযাপন দেখে ব্যথিত হন এবং তাদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। তিনি প্রায়ই অবসর সময়ে সেই পিছিয়ে থাকা নারীদের সঙ্গে মিশতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন। গ্রামের নারীরাও তার কাছে আসতেন।

আফরোজা বুঝতে পারেন, বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে নারীদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এমন অনুধাবন থেকে গ্রামের ২০ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ সদস্য নিয়ে তিনি ২০১৬ সালে 'রেনেসা গণগবেষণা সমিতি' গড়ে তোলেন। সমিতির সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। বর্তমানে সমিতির মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ৫৫ হাজার ৬০০ টাকা। আফরোজা উক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আফরোজার নেতৃত্ব সমিতির সদস্য ও ভিডিটি সদস্যরা সঞ্চয়ের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন।

২০২০ সালের শুরুতে করোনা মহামারি শুরু হওয়ার পর আফরোজা এলাকায় ধনাঢ্য ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহ করে ৩০টি পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, লবন, তেল, সেমাই, চিনি ও সাবান বিতরণ করেন। ভিডিটির সহায়তা নিয়ে আফরোজা উঠান বৈঠক পরিচালনা করে মানুষের মাঝে স্যানিটেশন, জন্মনিবন্ধন, বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধ ইত্যাদি বিষয়ে এলাকায় সচেতনতা তৈরি করছেন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে আফরোজার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়েছে। এছাড়াও সামাজিক মানচিত্রে অঙ্কিত হতদরিদ্র পরিবারের সদস্যদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার জন্য তিনি নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করছেন।

আফরোজা আক্তার বানু বর্তমানে এক পুত্রসন্তানের জননী। তিনি সন্তানকে সুশিক্ষিত করা এবং নিজে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চান। পাশাপাশি ধনী-দরিদ্র সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার দিয়ে সবার মন জয় করে অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান।

''পৃথিবীতে যাহারা সাহস করিয়া নিজের জীবনের দ্বারা নব নব সমস্যার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হয়, তাহারাই সমাজকে বড়ো করিয়া তোলে। যাহারা কেবলই বিধি মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না।''

— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিছিয়ে পড়া মানুষের আশার প্রতীক ভাবিরন নেছা

মো. বাশারুল ইসলাম

মহৎ কিছু করতে চাইলে বয়স কোনো বাধা হতে পারে না। ভালো কিছু করার ইচ্ছে থাকলে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, জাতি-ধর্ম– কোনো বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। দৃঢ় মনোবল ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কোনো বাধা মাড়িয়ে সফলতা ছিনিয়ে আনা যায়। সেটাই বাস্তবে প্রমাণ করেছেন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী মোছা. ভাবিরন নেছা।

ভাবিরন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কাথুলি গ্রামের মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা। তিনি ১৯৬০ সালের ২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মো. আব্দুল কাদের, মায়ের নাম মোছা. নেছারন নেছা। সাত ভাই-বোনের মধ্যে ভাবিরনের অবস্থান দ্বিতীয়।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটতে থাকে ভাবিরনের শৈশব। বাবা আব্দুল কাদের তাকে ছয় বছর বয়সে তেরঘোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর লেখাপড়ার জীবন। ১৯৭২ সালে তিনি প্রাথমিকের পাঠ শেষ করেন।

এসডিজি বিষয়ক একটি কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী মোছা. ভাবিরন নেছা

১৯৭৩ সালে ভাবিরন ভর্তি হন উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৭৫ সালে মে মাসে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার বিয়ে হয় কাথুলী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কাথুলী গ্রামের মো. মজিবুর রহমান-এর সঙ্গে। বিয়েতে যৌতুক দিতে হয় পঁচিশ হাজার টাকা ও একটি স্বর্ণের চেইন।

নতুন দম্পতির সংসার খুব ভালোভাবেই হাসিখুশিতে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। বিয়ের দু বছর পর প্রথম সন্তানের মা হন ভাবিরন।

ভাবিরনের স্বপ্ন ছিল নিজের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া। তাই তিনি ১৯৮৬ সালে স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিসে চাকরি নেন। নিজের আরও পরিচিতি বাড়নোর জন্য ১৯৯২ সালে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতে থাকেন তিনি। ১৯৯৭ সালে তিনি কাথুলি ইউনিয়নের ১, ২, ৩ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নারী সদস্য পদে নির্বাচন করেন এবং জয়লাভ করেন। ভাবিরনের সুযোগ হয় আর বড় পরিসরে সমাজসেবামূলক কাজ করার। এরপর ২০১৬ ও ২০২২ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হন। এরমধ্যে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন তিনি।

২০১৯ সালের মে মাসে ভাবিরন নেছার সঙ্গে দেখা হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. বাশারুল ইসলামের (বর্তমান গল্পের লেখক) সঙ্গে। বাশার ভাবিরনকে একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলেন। বাশারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভাবিরন ২০১৯ সালের জুন মাসে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেড়ে যায় ভাবিরনের আত্মশক্তি ও জানার পরিধি। 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'– এই স্লোগান তথা বিশ্বাসকে সামনে রেখে সুন্দর ও দরিদ্রমুক্ত আগামীর স্বপ্ন দেখেন ভাবিরন এবং যুক্ত হন নানাবিধ সামাজিক কাজে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নারীনেত্রীর সম্মাননা গ্রহণ করছেন মোছা. ভাবিরন নেছা

ভাবিরন ২০২০ সালে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক প্রশিক্ষণে (২২৬তম ব্যাচ) অংশ নেন। এবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে যুক্ত হন সামাজিক কাজে। তিনি তাঁর গ্রামের ৫০ জন নারীকে নিয়ে গড়ে তোলেন 'কাথুলি নিজ মহিলা গণগবেষণা সমিতি'। এই সংগঠন তার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তিনি এর মাধ্যমে তিনি নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া দু শতাধিক হতদরিদ্র পরিবারকে বিভিন্নভাবে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নিয়ে আসেন। করোনার থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত রকম সামাজিক সমস্যা এসেছে ভাবিরন নিজে এবং গ্রামের সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেগুলোর মোকাবিলা করেছেন।

একজন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী হিসেবে ভাবিরন ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রচারাভিযান করা, নারী নির্যাতন রোধে উঠান বৈঠক, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক, ঝরে পড়া প্রতিরোধে উঠান বৈঠক এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। ফলে ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নারীনেত্রী হিসেবে সম্মাননাস্বরূপ ক্রেস্ট পান।

ভাবিরন ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য, ইউনিয়ন Acceptable ফোরাম-এর সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বয়স, অভিজ্ঞতার কারণে ভাবিরন নেছা এখন অনেকটাই পরিপূর্ণ একজন মানুষ। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়েই আজকের এই পর্যায়ে আসতে পেরেছেন। এখন তার মনোবল বেড়েছে, বেড়েছে মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা। আর এগুলোকে অবলম্বন করেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে চান তিনি।

"তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো।"
– নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

মানুষের আপন মানুষ ফেরদৌসি খাতুন

■ মো. হেলাল উদ্দীন হাসান

অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে জীবনকে নতুন করে সাজিয়েছেন তিনি। অভাবকে পিছে ফেলে সংসারে নিয়ে এনেছেন স্বাবলম্বিতা। বলছি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের সাহারবাটি গ্রামের অদম্য নারীনেত্রী ফেরদৌসি খাতুনের কথা।

ফেরদৌসির জন্ম মুক্তযুদ্ধকালীন, ১৯৭১ সালে। তার বাবা হবিবার পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। আর মা জাহান্নারা ছিলেন গৃহিণী।

শৈশব-কৈশোরে ফেরদৌসি ছিলেন একজন ভালো ছাত্রী। লেখাপড়ার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। দেখতে দেখতে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বালিকা সাহারবাটি চারচারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেন। মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়ার আগ্রহ নিয়েই ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু মাধ্যমিকের সিঁড়ি পার হওয়ার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় ফেরদৌসিকে। কোনোভাবেই তিনি তার বাল্যবিবাহ মেনে নিতে পারেননি। ফেরদৌসির ভাষায়, 'আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে আমি নাকি বড় হয়ে গেছি, এলাকার সবার বিয়ে হচ্ছে, আমার বিয়ে না হলে সমাজের লোকজন আমাকে নিয়ে অনেক কথা বলবে। বাবার সম্মান নষ্ট হবে।'

কিন্তু ভাগ্যের লিখন, না যায় খণ্ডন। স্বামীর ছিল অভাবের সংসার। কিন্তু থেমে যাননি তিনি। কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এই ভাবনা তার মাথার মধ্যে সবসময় ঘুরপাক খেতে থাকে। সে সময় তিনি সাবেক এক ইউপি সদস্যের কাছ থেকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন। বিপুল আগ্রহ নিয়ে ফেরদৌসি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। ওই প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান ও আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফেরদৌসি নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করে। তাই বড় পরিসরে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি ২০০৮ সালে ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা পদে প্রার্থী হন এবং জয়লাভ করেন। সেই শুরু, এরপর থেকে বর্তমানে (২০২৪) তিনি বারবার নির্বাচিত হয়ে সেই পদে বহাল রয়েছেন। কারণ

এলাকার মানুষ মানুষ চিনতে, তাদের আপনজন ফেরদৌসিকে চিনতে ভুল করেনি। যেহেতু নির্বাচিত হয়ে ফেরদৌসি এলাকার মানুষকে ভুলে যাননি, বরং বিপদে-আপদে সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

ফেরদৌসি বাল্যবিবাহ বন্ধে খুবই সোচ্চার। তিনি এখন পর্যন্ত পাঁচটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তিনি শিশুর জন্মনিবন্ধন, শিশুর টিকা ও গর্ভবতী নারীদের টিকা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন এবং এ বিষয়ে অসহায় মানুষকে সহায়তা দেন।

নিজ বাড়িতে কাপড় সেলাই করছেন নারীনেত্রী ফেরদৌসি খাতুন

ফেরদৌসি গ্রামের কয়েকজন দরিদ্র নারীকে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এলাকার নারীদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক (সেলাই) প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন। সেসব প্রশিক্ষণে ফেরদৌসি নিজেই প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ জন নারী নিজ বাড়িতে বসে কাপড় সেলাই করে আয় করছেন।

যোগ্য সংগঠক হওয়ার কারণে এবং সমাজ সেবামূলক কাজে অবদান রাখার জন্য ফেরদৌসি এলাকার মানুষের কাছে এক অতি পরিচিত মুখ এবং তাদের আপন মানুষ।

ফেরদোসি খাতুন স্বপ্ন দেখেন, তাদের ইউনিয়ন একটি মডেল ইউনিয়নে পরিণত হবে, যেখানে কেউ বাল্যবিবাহের শিকার হবে না, যেখানে থাকবে না যৌতুক ও নারী নির্যাতন। প্রত্যেক নারী হবে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী। তিনি আসছে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করতে চান, যার মাধ্যমে আরও বড় পরিসরে মানুষের সেবা করার সুযোগ তৈরি হবে বলে তিনি মনে করেন।

শূন্য থেকে পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ী নূরজাহান

■ শ্রী সাধন কুমার দাশ

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়চেতা আত্মবিশ্বাস থাকলে জীবন চলার পথে কোনো বন্ধুর পথই যে বাধ সাধতে পারে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ নারীনেত্রী নূরজাহান পারভীন।

নূরজাহানের জন্ম ১৯৮৩ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা হোগলবাড়িয়া গ্রামে। দরিদ্র কৃষক ইবাদত মোল্লা ও জয়গন্নেচ্ছা দম্পতির আট সন্তানের মধ্যে নূরজাহান সর্বকনিষ্ঠ। দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন কতটুকু নির্মম ও নিষ্ঠুর হতে পারে ছোটবেলা থেকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন তিনি। অভাবের সংসারে খেয়ে না খেয়ে কোনোরকম জীবন ধারণ করে দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ হয় তার। ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শিখে হবেন শিক্ষক, ঘোচাবেন পরিবারের অভাব, পরিবারের অসচ্ছলতা। কিন্তু বাল্যবিবাহের কালো থাবা তার সব স্বপ্ন ম্লান করে দেয়। তিনি একই ইউনিয়নের কোদাইলকাটি গ্রামে দরিদ্র এক কৃষক পরিবারের ঘরণী হয়ে যান। সব স্বপ্ন থেকে যায় অধরা। মেয়ে হয়ে জন্মে নিজের পরাধীনতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না, যদিও বিষয়টি তাকে বেশ ভাবিয়েছিল।

নিয়তিকে মেনে নিয়ে নতুন জীবন সুখের হবে– এই আশায় বুক বেঁধে সংসার করতে থাকেন নূরজাহান। কিন্ত হায়! বাবার পরিবারের চাইতেও করুণ দুর্দশার ঘন মেঘ যেন জেঁকে বসে আছে স্বামীর ঘরে। কোনোদিন খেয়ে অথবা না খেয়ে অর্ধাহারে দিন যেন যেতে চাইতো না। তবুও জীবন চলতে থাকে, জীবনের সঙ্গে চলতেও হয়। কিন্তু তার জীবনে আশার আলো হয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

২০১২ সালে নূরজাহান অংশগ্রহণ করেন 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১০৭তম ব্যাচ)। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণের পর পাল্টে যায় নূরজাহানের চিন্তার ধরন, পাল্টায় তার জীবনের দৃশ্যপট। তিনি নতুন করে নিজেকে খুঁজে পান, নিজেকে চিনতে পারেন নবরূপে। নিজের পরিবর্তন নিজেকেই ঘটাতে হবে– এই দৃঢ়চেতা মনোভাব তৈরি হয় তার মধ্যে।

উজ্জীবিত নূরজাহান গ্রামে ফিরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক আয়োজিত একটি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে (সেলাই) অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করেন।

পরের চিত্রপট গল্পের মতোই সুন্দর! কাজের দক্ষতা ও সামাজিক পুঁজি ধীরে ধীরে তার অর্থনৈতিক ভীত গড়ে দেয়। কিছু টাকা সঞ্চয় করে শুরু করেন হাঁস, মুরগি, কবুতর ও ছাগল পালন। পাশাপাশি স্বামীকে স্থানীয় রাজমিস্ত্রির দলে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন নূরজাহান। তার ছাগল পালন ও দর্জির কাজে মিলে সফলতা। এরপর তিনি একটি গাভি পালতে শুরু করেন। পাশাপাশি বাড়ির পাশে পতিত জমিতে সবজি চাষও শুরু করেন। নূরজাহান এখন প্রতিমাসে গড়ে ২০ হাজার টাকা আয় করেন। যে নূরজাহান একসময় অর্থকষ্টে নিমজ্জিত ছিলেন, পারিবারিক কলহে ছিলেন জর্জরিত ছিলেন, সেই তিনি এখন একজন আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী নারী।

আগে নূরজাহান তার দু সন্তানের লেখাপড়ার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। কিন্তু এখন আর তার সেই চিন্তা নেই। নূরজাহান আগে ছিলেন একজন সাধারণ গৃহবধূ।

এখন তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। তিনি এখন পর্যন্ত ১০টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতন বন্ধে উঠান বৈঠক, বাল্যবিবাহ রোধে পাড়ায় পাড়ায় অভিভাবকদের বোঝানো, করোনার সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ঝরে পড়া রোধ, গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা-সহ নানাবিধ সামাজিক কাজে দিন কাটে তার।

নূরজাহান এখন একজন দক্ষ দর্জি প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সংস্থায় সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ কোদাইলকাটি গ্রামে তৈরি করেছে ব্যতিক্রম উদাহরণ, তাকে দেখে স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন স্থানীয় নারীরা। তার শূন্য থেকে পূর্ণ হওয়ার গল্প এখন অনেকের মুখে।

না।

ছোটবেলা থেকে সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর সেবা করার অদম্য ইচ্ছা ছিল তাহমিনার। তাই এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন জীবনের বাকি সময়টুকু সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে যাবেন। এভাবে তাহমিনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ২৮টি বসন্ত পার হয়ে যায়, কিন্তু তার বিয়ে হয় না। তিনি চালিয়ে যান বিভিন্ন উদ্যোগ।

হঠাৎ ষোলটাকা ইউনিয়নের এলাঙ্গী গ্রামের অলি চাঁদকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন তাহমিনা। বেশ কিছুদিন আগে তিনটি ছোট ছোট সন্তান রেখে মারা যান অলি চাঁদের স্ত্রী। ওলি চাঁদ সেই সময় সন্তানদের নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। এই ঘটনা শুনে তাহমিনার মনে শিশু তিনটির জন্য খুব মায়া হলো। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন এই তিনটি শিশুকে মানুষ করার জন্য তিনি অলি চাঁদকেই বিয়ে করবেন। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কারণ তিন সন্তানের জনকের সঙ্গে আমাদের এই সমাজে একজন অবিবাহিত নারী খুব সহজেই বিয়ে বসতে রাজি হয় না। শুধু মানবিক দিক বিবেচনা করেই তাহমিনা এই বিয়েতে সম্মত হন।

অবশেষে ১৯৯৪ সালে অলি চাঁদের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেন তাহমিনা। সময়ের ধারাবাহিকতায় দুই কন্যাসন্তান জন্ম দেন তাহমিনা। আগের পক্ষের তিন সন্তান-সহ মোট পাঁচ সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের আত্মকর্মসংস্থানে যুক্ত করে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত তাহমিনাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়।

২০১৩ সালে ইউপি সদস্য মো. শামীম আহমেদের কাছে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারে তাহমিনা। তিনি বুঝতে পারেন, তার ছোটবেলার স্বপ্ন গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে কাজ করতে হলে এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে হবে। তাই তিনি বিপুল আগ্রহ নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এর এক বছর পর ২০১৪ সালে অংশ নেন ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণ দুটির মাধ্যমে তাহমিনার মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে কীভাবে কাজ করা যায় এবং সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে কীভাবে সমাজে

প্রতিষ্ঠিত হতে হয় তা জানতে পারেন তিনি।

প্রশিক্ষণ শেষে বাড়িতে ফিরে গ্রামের হতদরিদ্র ২০ জন নারীকে নিয়ে তাহমিনা একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে সমিতির পথচলায় অনেক বাধা থাকলেও তা কাটিয়ে ওঠতে সক্ষম হন তাহমিনা। বর্তমানে সমিতির সমৃদ্ধির ঝুলিতে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য সফলতা। সমিতির বর্তমান সঞ্চয় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। সমিতির সদস্যরা সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে কৃষিজমি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন-সহ বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সমিতির মাধ্যমে তৈরি হয়েছে সাতজন নারীর কর্মসংস্থান।

গ্রামের শিশুদের বিনামূল্যে লেখাপড়া করাচ্ছেন নারীনেত্রী মোছা. তাহমিনা খাতুন

তাহমিনা এখন পর্যন্ত বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিতকরণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, বৃক্ষরোপণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে ৫০টির অধিক উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছেন। তিনি বিনামূল্যে তার পাড়ার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাদান করছেন। বর্শা খাতুন (পিতাঃ আমজাদ আলী, মাতাঃ রেহেনা খাতুন), ইশিতা খাতুন (পিতাঃ আরজান মিয়া, মাতাঃ রাইলা খাতুন) সহ পাঁচটি বাল্যবিবাহ এবং চারটি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তিনি ২০ জন ঝরেপড়া শিক্ষার্থীকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করতে পেরেছেন।

নারীনেত্রী মোছা. তাহমিনা খাতুন এলাংগী গ্রাম উন্নয়ন দলের সহ-সভাপতি এবং এলাংগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নানামুখী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিভিন্ন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠেছেন।

তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে সক্রিয় অচিন্তা দাশ

সাধন কুমার দাশ

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের কোলঘেঁষা বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার একটি ছোট্ট ইউনিয়নের নাম বেতাগা। স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় সম্পদের সুষম ব্যবহার করে উন্নয়নের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ২৩ বর্গ কিলোমিটারের এই ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বেতাগা গ্রামের একজন স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী নারীর নাম অচিন্তা দাশ।

অচিন্তার জন্ম ১৯৮২ সালের ১৪ জানুয়ারি, বাগেরহাটের সদর উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের রনজিতপুর গ্রামে। তার বাবার নাম সনাতন দাশ, আর মায়ের নাম নিভা রাণী দাশ। তিন ভাই-বোনের মধ্যে অচিন্তা সবার ছোট। বাবা সনাতন দাশ ছিলেন একজন হতদরিদ্র কৃষক। অন্যের বাড়িতে দিনমজুর খেটে কোনোরকম লবণ-ভাতে চলত তার সংসার।

দরিদ্রতার কারণে এসএসসি পাসের আর আর লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি অচিন্তার। ২০০২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পার্শ্ববর্তী বেতাগা ইউনিয়নের নৃপতি দাশের পুত্র বিদ্যুৎ দাশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

বাবার মতো স্বামীর পরিবারও ছিল অস্বচ্ছল। এদিকে সময়ের ব্যবধানে এক কন্যাসন্তানের মা অচিন্তা। স্বামীর একার আয়ে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বাড়তি দু মুঠো চাল-ডালের আশায় অন্যের বাড়িতে কাজ করতে থাকেন অচিন্তা। কিন্তু অচিন্তা দরিদ্রতাকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পেতে নানা উপায় খুঁজতে থাকেন। এ নিয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পথের দিশা পেলেন না তিনি।

২০১২ সালের শেষের দিকে বেতাগা ইউনিয়নে কর্মরত দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী সাধন কুমার দাশের (বর্তমান গল্পের লেখক) সঙ্গে কথা হয় অচিন্তার। সাধন তাকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। অচিন্তা সাগ্রহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই প্রশিক্ষণে (৮৩তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হয় তার মনোজগত, তৈরি হয় নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা, সৃষ্টি হয় প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর বিজয়ী হওয়ার মানসিকতা। নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি অন্যের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনা কষতে থাকেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে তিনি সিদ্ধান্ত নেন নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করবেন। কারণ তিনি শিখেছেন ও বিশ্বাস করেছেন যে, 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'। 'আমরা নারী, আমরা পারি'– এই প্রত্যয়কে বুকে ধারণ করেন তিনি। এরপর অচিন্তা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আয়োজনে গাভি পালন ও বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। স্বামীর সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে স্বামীর আয়ের সামান্য টাকা ও নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা ও ১৫টি মুরগির ছানা ক্রয় করেন অচিন্তা। সেগুলো ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এবং এক পর্যায়ে বড় মুরগিতে পরিণত হলে ডিম দিতে থাকে। ছাগলেরও দুটি বাচ্চা হয়। এরপর সেগুলো বিক্রি করে একটি বকনা বাছুর কেনেন অচিন্তা। বর্তমানে তার তিনটি গাভি ও দুটি গরুর বাচ্চা রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ লিটার দুধ বিক্রয় করছেন অচিন্তা। এতে তার প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টাকা আয় হয়। এর মাধ্যমে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে অচিন্তার পরিবারে।

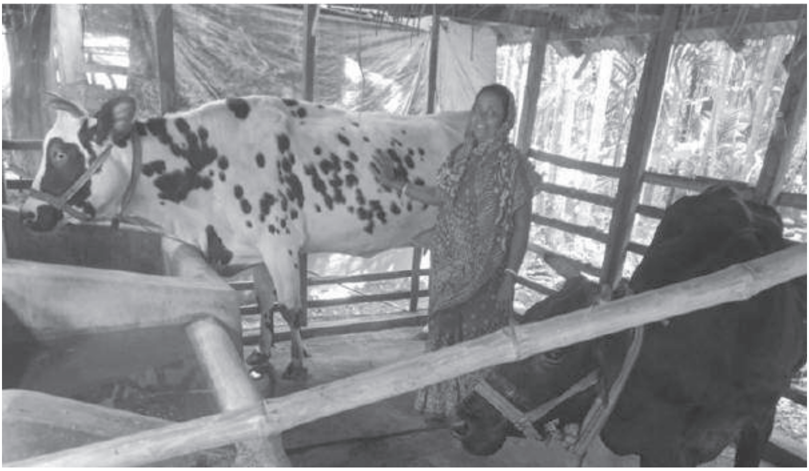

নিজ বাড়িতে গাভি পালন করছেন নারীনেত্রী অচিন্তা দাশ

নানান ধরনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হয়ে তৃণমূলে এসডিজি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন অচিন্তা দাশ। তিনি হাঁস-মুরগি, গাভি পালন ও মৎস্য চাষ করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য হতরিদ্র মানুষদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক আয়োজন করেন। ওয়ার্ডসভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে হতদরিদ্র মানুষকে ভিজিডি (ভিডব্লিউডি) ও ভিজিএফ কার্ড পেতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সুপারিশ করেন। তার সুপারিশের কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭নং ওয়ার্ড থেকে ৮-১০ জন হতদরিদ্র মানুষ সরকারি বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাচ্ছে।

অচিন্তা দাশ বেতাগা গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি এবং বেতাগা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৭নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নিয়মিত নারীনেত্রীদের ফলোআপ সভায় উপস্থিত থাকেন। ভিডিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত হয়ে সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধ, মাদক রোধ এবং জলাবদ্ধতা নিরসন-সহ স্থানীয় সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভিডিটির সক্রিয় ভূমিকার কারণে বেতাগা গ্রামে ২০২৩ সালে পাঁচটি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে। জলাবদ্ধতার সমস্যা এখন আর নেই। ২০২৩ সালে বেতাগা ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে পুষ্টি কার্যক্রম শুরু হলে অচিন্তা দাশ বেতাগা গ্রামের ১৬ জন হতদরিদ্র গর্ভবতী নারীর তালিকা তৈরিতে সহযোগিতা করেন।

অচিন্তা দাশ স্বপ্ন দেখেন, বেতাগা ইউনিয়ন হবে বাল্যবিবাহমুক্ত ইউনিয়ন। যে ইউনিয়নে যৌতুক ও নারী নির্যাতন থাকবে না। প্রতিটি শিশু লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবে, নারীরা হবে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী। সবাই স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা পাবে। এরকম একটি ইউনিয়ন গড়ার প্রত্যাশা বুকে ধারণ করে এবং এ প্রত্যাশা সবার মাঝে জাগ্রত করার লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছেন তিনি।

‘এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবে না। যারা খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখেও কিছু করে না, তাদের জন্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে।’

– আইনস্টাইন

সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত নারীনেত্রী কহিনুর বেগম

মনিরুজ্জামান

সমাজে দু ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল শুধু ভাগ্যকে দোষারোপ করে নানান অজুহাত দেখিয়ে পশ্চাৎপদতাকে মেনে নেয়। আরেক দল আত্মকর্ম দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে নেয়, পাশাপাশি অবদান রাখে সমাজ ও রাষ্ট্রে। উজ্জীবক ও নারীনেত্রী কহিনুর দ্বিতীয় দলের মানুষ।

কহিনুর-এর জন্ম ১৯৮৪ সালের ১৬ জুলাই, বাগেরহাট সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের আফরা গ্রামে। তার বাবা শেখ ফজিলত ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক, আর মায়ের নাম সাহিদা বেগম। চার ভাই-বোনের মধ্যে কোহিনুর তৃতীয়।

কহিনুর-এর লেখাপড়া শুরু হয় আফরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পরে রাংদিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০০ সালে এসএসসি পাস করেন তিনি। সে বছর তার বিয়ে হয়ে যায় ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের রণভূমি গ্রামে। স্বামী মাহবুবুর রহমান একজন শিক্ষিত বেকার। প্রাইভেট পড়িয়ে কোনোরকমভাবে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। কোহিনুরও প্রাইভেট পড়াতে শুরু করেন। দু'জনের আয়ে সংসার ভালোভাবে চলতে শুরু করে। এভাবে সুখে-দুখে কেটে যায় কহিনুর-এর সংসার জীবন।

২০১২ সালের মে মাসের কথা। প্রতিবেশী আতিয়ার শেখের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কহিনুর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ওই প্রশিক্ষণ তাকে হাতধরে পথ দেখায়। বিশেষ করে কীভাবে একজন স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে ওঠতে হয়, কীভাবে মানুষের পাশে থেকে তাদের ভাগ্যের উন্নয়নে কাজ করতে হয় এবং কীভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আলোর পথ দেখাতে হয়। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ কহিনুরকে পূর্ণমাত্রায় একজন উজ্জীবিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠতে সহায়তা করে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কহিনুর বেগম খুলনায় সিএসএস আভা সেন্টারে আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ তাকে আরও শাণিত করে তোলে।

সেই থেকে একজন স্বেচ্ছাবতী হিসেবে কহিনুর-এর পথচলা। প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে প্রথমেই তিনি ২০ জন হতদরিদ্র নারী নিয়ে 'দোয়েল গণগবেষণা সমিতি' গঠন করেন। বর্তমানে এর মূলধন দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। সমিতি থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে বেশ কয়েকজন হতদরিদ্র নারী নানা আয়মুখী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন আমেনা, শাহানা, রাবেয়া এবং রেখা। তারা প্রত্যেকেই এখন স্বাবলম্বী নারী। আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করার কারণে তারা পেট ভরে দু মুঠো খেতে পারছেন। এছাড়া সমিতির সদস্যদের নিয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজও করছেন কহিনুর।

রণভূমি গ্রাম উন্নয়ন দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় উদ্যোগে স্থানীয় সমস্যার সমাধান তথা তৃণমূলে এসডিজির অভীষ্ট অর্জনে ভূমিকা পালন করছেন কহিনুর। তিনি পাড়ার মানুষের কাছে বিশেষ করে দরিদ্র অসহায় মানুষের অতি আপনজন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হয়ে ওঠেছেন গণমানুষের নেত্রী।

গ্রাম উন্নয়ন দলের ফলো-আপ সভায় নারীনেত্রী কহিনুর বেগম

কহিনুর সব ধরনের দরিদ্রতার শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে স্বাবলম্বী হতে নারীদের উৎসাহ যোগান। এজন্য মাঠে ফসল ফলানো, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন করা, ক্ষুদ্রাকার ঘেরে মাছ চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন তিনি। কহিনুর-এর বুদ্ধি-পরামর্শ ও উৎসাহে রাহিলা, সালমা এবং কাকলি দরিদ্রতার শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। কহিনুর ও অন্য নারীরা আইপিএম পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো সার) ব্যবহার করে রাসায়নিক সারমুক্ত সবজির ফসলাদি উৎপাদন করে তারা নিজেরা যেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তেমনি অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি পালন করে তারা প্রতিদিন স্থানীয় বাজারে দুধ ও ডিমের যোগদান দিচ্ছেন।

স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা গ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহিত করছেন কহিনুর। ক্লিনিকে যাতে সেবার মান ঠিক থাকে এবং জবাবদিহিতা তৈরি হয় সেজন্য কাজ করছেন তিনি। পাশাপাশি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিশেষ করে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে তিনি পুষ্টি ও টিকার ব্যাপারে গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা ও অভিভাবকদের সচেতন করে চলেছেন। শিশুর টিকা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠক অব্যাহত রেখেছেন কহিনুর।

এলাকার শতভাগ শিশু যাতে বিদ্যালয়গামী হয় সেজন্য তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহ যোগান এবং সহায়তা করেন। স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে ঝরেপড়া রোধে ১৫টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন তিনি। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখেন কহিনুর।

বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কহিনুর ও অন্য স্বেচ্ছাব্রতীরা এখন সংঘবদ্ধ। তাই তো সুরাইয়া, সাফিয়া, ময়না এবং জামিলার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। হালিমার নারী নির্যাতন বন্ধ করে তাকে স্বামীর সংসারে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করেছেন কহিনুর। শুধু প্রতিরোধ নয়। সেবামূলক কাজ, যেমন গর্ভবতী নারীর টিকা, শিশুর টিকা ও গর্ভবতী নারীর নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ– সবখানে পরিলক্ষিত হয় কোহিনুর-এর পদচারণা।

২০২০ সালের শুরুতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় হন কহিনুর। তিনি সে সময় সিআরবির কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উঠান বৈঠক, থ্রি ওয়াশ ক্যাম্পেইন, হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে তিনি এবং গ্রামের অন্য স্বেচ্ছাব্রতীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যে কারণে রণভূমি গ্রামে করোনা আঘাত হানতে পারেনি।

এলাকার মানুষজন কহিনুরকে তাদের আপনজন মনে করে। বিপদে-আপদে তারা কহিনুর-এর কাছে ছুটে আসে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বর্তমানে কোহিনুর বেগম এবং স্বেচ্ছাব্রতীরা পরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। গত বর্ষা মৌসুমে তারা প্রায় ৫ শ' বৃক্ষ রোপণ করতে পেরেছেন।

কহিনুর বেগম একজন অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া নারীনেত্রী। তিনি এখন নারীদের আশা-ভরসার প্রতীক, অনুপ্রেরণার উৎস।

মাধুরী এখন অদম্য সমাজকর্মী

নয়ন মন্ডল

আজ থেকে ২৪ বছর আগে বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের কঁচুবুনিয়া গ্রামের বধূ হয়ে আসেন মাধুরী অধিকারী। সুন্দরবনের কোলঘেঁষা এই গ্রামে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি এখনও।

মাধুরীর জন্ম ১৯৭৬ সালের ১২ মে, বাগেরহাটের মোংলা উপজেলার মিঠাখালী ইউনিয়নের সাহেবের মেঠ গ্রামে।

মাধুরীর স্বামী নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার বাবার নাম বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, আর মায়ের নাম পারুল বিশ্বাস। বাবার সামান্য কৃষিজমি চাষাবাদের আয়ে সংসার চলে না। তাই স্বামী ঘরের বাইরে বিভিন্ন কাজে যায়। মাধুরীও বসে থাকেন না। দু'চারটে হাঁস-মুরগি পোষে সংসারের আয় বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

এসএসসি পাসের পর পারিবারিক সিদ্ধান্তে ১৯৯৮ সালে বিয়ে হয় মাধুরী। এরপর দেখতে দেখতে বিয়ের পর ১২ বছর কেটে যায় মাধুরীর। এ সময় এক পুত্র ও এক কন্যার মা হন তিনি। ঘরের বধূ অনেকটাই ঘরে থাকার মতো করে সময় কেটে যাচ্ছিল তার।

মাধুরী ২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৬৫ তম ব্যাচ) অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণ থেকে তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষনটি তার জীবনে বয়ে আনে আমূল পরিবর্তন। তিনি পরিবার ও সমাজে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন। তার মধ্যে তৈরি হয় সামাজিক দায়বদ্ধতাবোধ।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন মাধুরী। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলেন কঁচুবুনিয়া গ্রাম উন্নয়ন দল (ভিডিটি)। ভিডিটির মাধ্যমে তিনি স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করেন। ভিডিটির সদস্যদের সহযোগিতায় মাধুরী গত এক বছরে তিনটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। শালিসের মাধ্যমে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করেন পাঁচটি। এছাড়া তিনি

পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও মাদকের কুফল এবং সহিংসতা ও ধর্মীয় গোড়ামী বন্ধে সচেতনতা গড়ে তোলেন।

মাধুরী বয়স্ক স্কুল খুলে এলাকার মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণে এখন এলাকার প্রায় সবাই স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়েছে। এটি বলতে গেলে মাধুরী অধিকারীর একটি বড় অর্জন।

কঁচুবুনিয়া দুর্যোগপূর্ণ এলাকা। বছরের অধিকাংশ সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। তাই এলাকার মানুষের কাছে বিপদ সংকেত পাঠানো, তাদেরকে বিশেষ করে গর্ভবতী নারী ও শিশুদের আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উৎসাহ যোগান এবং সহযোগিতা করেন।

উঠান বৈঠকের নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী মাধুরী অধিকারী

একটি সভায় উপস্থিত নারীনেত্রী মাধুরী অধিকারী (সর্ব বামে উপবিষ্ট)

শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধেও তিনি সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে মাধুরীর খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। ইউনিয়নের মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের সেবা (যেমন, বিধবা ভাতা কার্ড, বয়স্ক ভাতা কার্ড, মাতৃত্বকালীন সেবা কার্ড) পেতে তিনি অসহায় মানুষদেরকে সহযোগিতা করেন।

মাধুরী গ্রামের মানুষকে নিয়ে ওয়ার্ড সভায় যোগদান করেন। সেখানে এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

সামাজিক কাজের পাশাপাশি পরিবারের আয় বাড়াতেও সক্রিয় রয়েছেন মাধুরী। বর্তমানে তিনি গরু ও ছাগলের খামার পরিচালনা, হাঁস-মুরগি পালন ও বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করছেন। তার গরুর খামারে গরু রয়েছে ১২টি। আয় বৃদ্ধিমূলক এসকল কাজের মাধ্যমে নিজ পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন মাধুরী। সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তার এক সন্তান পল্লী চিকিৎসক।

নারী-পুরুষের সমতার সমাজ গড়তে চান ময়না বেগম

মো. মেহেদী হাসান

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি প্রশিক্ষণ পাল্টে দিয়েছে আমার জীবন,'– এমন মন্তব্য বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের মধ্য বরিশাল গ্রামের নারীনেত্রী ও গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি নারীনেত্রী ময়না বেগম-এর। বদলে যাওয়া ময়না বেগম এখন তৃণমূলের এক আত্মপ্রত্যয়ী সমাজকর্মী।

ময়নার জন্ম ১৯৮৪ সালে, বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার খাউলিয়া ইউনিয়নের পশুবুনিয়া গ্রামে। তার বাবা শামসুল আলম একজন দিনমজুর, আর মা জাহানারা বেগম ছিলেন গৃহিণী। চার ভাই-বোনের মধ্যে ময়না সবার ছোট। জন্মের পর ময়না যে পৃথিবীর মুখ দেখেন, তার জন্য সে পৃথিবী ছিল অভাব-অনটনের। অভাবের নিত্যসঙ্গী হয়ে কাটতে থাকতে দিন, বড় হতে থাকেন ময়না।

প্রাথমিকের পাঠ শেষ করতে পারলেও অভাবের কারণে সপ্তম শ্রেণির বেশি পড়ার সুযোগ পাননি তিনি। পরে পারিবারিক সিদ্ধান্তে ১৯৯৮ সালে বাল্যবিবাহের শিকার হন তিনি। বাবার সংসারে অভাব দেখে বড় হওয়া ময়না স্বামীর সংসারে এসেও একই চিত্র দেখতে পান। তার স্বামী দিনমজুর ও জেলে। সময়ের ধারাবাকিতায় অভাবে সংসারে আসে নতুন অতিথি, এক মেয়ে ও দুই ছেলে। পরিবারের আকার বড় হয়, সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে খরচের বোঝা। সংসারের ব্যয়ভার মেটাতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়েন ময়না।

সে সময় ২০১৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৫৭তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে

তিনি সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠেন তিনি এবং তার মধ্যে তৈরি হয় সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ।

প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফিরে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলার পরিকল্পনা নেন ময়না। তিনি কম পুঁজি ও কম ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির সামনের দশ শতক জমিতে শুরু করেন শাক-সবজি চাষ। বাড়তি যত্নের কারণে দ্রুত ফল পান তিনি। মাত্র ৭৫০ টাকা বিনিয়োগে শাক-সবজি বিক্রি করে তিনি ৬ হাজার টাকা আয় করেন। এতেই খুলে যায় তার আত্মবিশ্বাসের দরজা। আর পেছনে তাকাতে হয়নি ময়না বেগমকে।

এর পাশাপাশি ২০টি দেশি মুরগি নিয়ে শুরু করেন একটি দেশীয় মুরগির খামার। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পাল্টাতে থাকে ময়নার ভাগ্যের চাকা। এরপর ঋণ নিয়ে একটি গাভি ক্রয় করেন তিনি। বাড়তে থাকে তার আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। স্বাবলম্বিতা আসে ময়নার পরিবারে।

এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীতে তিনি জলবায়ু সহনশীল উন্নত জাতের রাজহাঁসের খামার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার খামারে ২০টি রাজহাঁস ও ১২টি খাঁকি ক্যাম্পবেল জাতের হাঁস রয়েছে, যেগুলো নিয়মিত ডিম দেয়। ময়না ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে ঋণের কিস্তি ও পারিবারিক খরচ মেটান। তিনি নিজে খুব বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। কিন্তু সন্তানদের ক্ষেত্রে তা হতে দিতে চান না। তাই তিনি সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বেশ যত্নশীল।

একজন নারীনেত্রী হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন ময়না বেগম। মধ্য বরিশাল গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে তার দ্রুত চিকিৎসা পেতে তিনি সহযোগিতা করেন। স্থানীয় নারীদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ করে অসহায় মানুষের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করেন। তিনি গ্রামের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের ব্যাপার খোঁজ নেন এবং ঝরেপড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামী করেন। ময়না স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়মিত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

মধ্য বরিশাল গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ময়না বেগম। নিয়মিত ভিডিটির সভার আয়োজন করা ও স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে ভিডিটির সদস্যদের উঠান বৈঠক পরিচালনা-সহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

স্থানীয় নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ময়না ‘বরিশাল নারী উন্নয়ন সমিতি’ নামে একটি গণগবেষণা সমিতি গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তার সমিতির সদস্য সংখ্যা ২০ জন এবং মূলধন প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সমিতির মূলধন বিনিয়োগ করা হবে।

ময়না বেগম-এর প্রত্যাশা হলো, সমাজে নারী-পুরুষের সমতার পরিবেশ নিশ্চিত হবে, সকল মানুষ বিশেষ করে নারীরা হবে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী। সে সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই নিবেদিত থাকতে চান তিনি।

‘প্রত্যেকেই নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উর্ধ্বে উঠতে পারে এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে, যদি সে যা করছে তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও সত্যিকারের আন্তরিক হয়।’

– নেলসন ম্যান্ডেলা

সুস্থ-সুন্দর আগামী প্রজন্ম গড়তে চান আছিয়া

■ মো. হুমায়ূন রশীদ জুয়েল

আছিয়া বেগম আর অসহায় নন, অদম্য ইচ্ছেশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি এখন অনেকটাই স্বচ্ছল। শুধু ব্যক্তি আছিয়া নন, তিনি একজন বলিষ্ঠ নারীনেত্রী। অথচ একটা সময় দু মুঠো ভাত যোগাড় করাই ছিল তার জন্য বিরাট কষ্টসাধ্য বিষয়।

আছিয়ার বাড়ি কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার তালজাঙ্গা ইউনিয়নের আড়াইউড়া গ্রামে। জন্ম ১৯৮৭ সালে ১০ সেপ্টেম্বর। তার বাবা আব্দুল হাকিম ভূঁইয়া একজন দরিদ্র কৃষক। আর মা হালিমা আক্তার একজন গৃহিণী। তিন পুত্রসন্তানের পর কন্যার আগমনে খুশি হয়েছিলেন বাবা-মা, আর তার তিন ভাই। তাই গ্রামের আলো-বাতাসে সবার আদরেই বড় হতে থাকেন আছিয়া।

তার স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম মানতে গিয়ে ২০১০ সালে পরিবারের সিদ্ধান্তে বাল্যবিবাহের শিকার হন আছিয়া। তিনি তখন তালজাঙ্গা আর. সি. রায় উচ্চ বিদ্যালয়ে মাত্র নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিলেন এবং লেখাপড়ায় ভালোই ছিলেন।

আছিয়ার বিয়ে হয় দামিহা ইউনিয়নের বজলুর রহমানের সঙ্গে। বিয়ের পর সুখে-শান্তিতে দিন যেতে থাকে তার। এর মধ্যে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন তিনি। নাম রাখেন শেখ আলম।

কথায় আছে, সুখ বেশি দিন যায় না। আছিয়ার কপালেই তা ঘটল। আছিয়া তার স্বামী বজলুর রহমানের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করেন। তিনি মাঝে মধ্যেই দেরি করে রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেন। আছিয়া তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যায়। মাদক ও জুয়া খেলায় পুরোপুরি আসক্ত যায় তার স্বামী। আছিয়ার ওপরও নির্যাতন চালাত। কারণ বজলুর রহমানের টাকার প্রয়োজন। আছিয়াকে জোর করেন বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক আনার জন্য। আছিয়াও নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে স্বামীকে দেন। স্বামী ওই টাকা মদ খাওয়া ও জুয়া খেলায় খরচ করে ফেলে। টাকা শেষ হলে আবার নির্যাতন চলে আছিয়ার

ওপর। আছিয়া টাকা আনলে নির্যাতন কয়েকদিন বন্ধ থাকে। আবার টাকার দরকার হলে তার ওপর বাড়ে নির্যাতন। অবশেষে কোনো উপায় না দেখে বাপ-ভাই সিদ্ধান্ত নিয়ে আছিয়াকে বাবার বাড়িতে নিয়ে আসেন।

আছিয়া নির্যাতনের হাত হতে রেহাই পায়। ছেলে আলমকে নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। এখনও তিনি বাবার বাড়িতেই আছেন। সঙ্গে আছে ১২ বছরের কিশোর ছেলে শেখ আলম। আছিয়া ছেলে আলমকে মানুষ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ছেলেও মায়ের স্বপ্ন পূরণে লেখাপড়া করছে। সে এখন আর.সি. রায় উচ্চ বিদ্যালয়েই অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আছিয়ার বাবা-মা এখন আর বেঁচে নেই।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী আছিয়া

বাবার বাড়িতে ফিরে আসার পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হন আছিয়া। সেই সময়কার ওয়ার্ড অ্যাকশন টিম এবং পরবর্তী সময়ে গঠিত গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে যুক্ত হন তিনি।

২০১৪ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন আছিয়া। এরপর ২০১৫ সালে ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৭৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ দুটি যেন আছিয়ার নিভু নিভু প্রদীপে আলোর সঞ্চার করে।

নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণের পর গ্রামে এসে নিবিড়ভাবে আড়াইউড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে যুক্ত হন আছিয়া। ছোট ছোট উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে আত্মনির্ভশীলতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যান তিনি। বসতবাড়িতে সবজি চাষ, হাঁস, মুরগি ও গরু পালন করে আছিয়া পরিবারের পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশপাশি আয় বাড়াতে সক্ষম হন। আছিয়া দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকেই সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এখন কাপড় সেলাই করে আয় করছেন। এভাবে নিজেকে স্বাবলম্বী করে তোলেন

আছিয়া। তিনি এখন প্রতিমাসে গড়ে ১০ হাজার টাকা আয় করেন। ছেলের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করছেন আছিয়া।

সঞ্চয়ের মানসিকতা থেকে তিনি নিজ গ্রামের নারীদের নিয়ে 'আড়াইউড়া গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়ে তুলেছেন। সঞ্চয়ের পাশাপাশি সমিতির মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আছিয়া স্থানীয় অসহায় মানুষদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় ভাতা পেতে সহযোগিতা করেন। তিনি নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন, স্থানীয় ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পেতে রোগীদের সহায়তা করেন। এছাড়া বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন তিনি।

পুত্র শেখ আলম-এর সঙ্গে নারীনেত্রী আছিয়া

আছিয়া নিয়মিত গ্রাম উন্নয়ন দলের সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে উঠান বৈঠক ও প্রচারাভিযানের আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা মিলে গ্রামের একটি সামাজিক মানচিত্র তৈরি করেছেন, সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করেছেন, যাতে এসডিজি গ্রাম গড়ে ওঠে।

আছিয়ার বেগম-এর ভবিষ্যতের জন্য এমন কিছু করে যেতে চান যাতে আগামী প্রজন্ম সুস্থ-সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠতে পারে। তার মতো যেন কাউকে বাল্যবিবাহের শিকার না হতে হয়, তার মতো নির্যাতনের শিকার হতে না হয়। তিনি স্বপ্ন দেখেন, একদিন তাদের গ্রাম হবে বাল্যবিবাহমুক্ত, প্রত্যেকটি নাগরিক বিশেষ করে নারীরা পাবে মর্যাদা, তারা হবে স্বনির্ভর।

"যদি স্বপ্ন দেখতে পারো, তবে তা বাস্তবায়নও করতে পারবে।"

– ওয়াল্ট ডিজনি

‘জয়িতা’ জয়ী আরজিনার সাফল্যগাঁথা

মো. মাহমুদ আলী

আত্মশক্তি ও একনিষ্ঠ পরিশ্রমই বদলে দিতে পারে একজন মানুষের জীবন। এই চিরন্তন সত্যটিই প্রমাণ করলেন টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার অলোয়া ইউনিয়নের নলুয়া গ্রামের নারীনেত্রী আরজিনা খাতুন।

আরজিনার জন্ম ১৯৭০ সালে। তার বাবার নাম আয়েজ উদ্দিন, আর মায়ের নাম আয়েশা।

সময়টা ছিল ১৯৯০ সাল। আরজিনার বয়স তখন ১৪ কিংবা ১৫ বছর। দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় পারিবারিক সিদ্ধান্তে একই গ্রামে বিয়ে হয় তার। সংসারের মানে বুঝে ওঠার আগেই তার কাঁধে আসে গুরু দায়িত্ব। বিয়ের দু বছর পর ১৯৯২ সালে তার কোলজুড়ে আসে প্রথম পুত্রসন্তান। এরপর ১৯৯৭ সালে তিনি কন্যাসন্তানের মা হন। কিন্তু কন্যার আগমনে তার বাবা খুব বেশি খুশি হতে পারেননি। স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে আরজিনার। সে সময় একটি ক্রয়কৃত জায়গায় থাকতেন আরজিনা দম্পতি। এক পর্যায়ে ১৯৯৯ সালে তার স্বামী দুটি অবুঝ সন্তান ও তাকে রেখে স্বামী তার পৈত্রিক বাড়িতে চলে যান। এ অবস্থায় আরজিনা খাতুনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কীভাবে তিনি টিকে থাকবেন এই জগত সংসারে, কীভাবে দুটি সন্তানের মুখে তুলে দেবেন আহার, আর কোথা থেকেই বা আসবে তাদের লেখাপড়ার খরচ।

কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্রী নন আরজিনা খাতুন। অবতীর্ণ হন জীবনযুদ্ধে। তিনি একটি সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করে, বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করেন। আয় আরও বাড়ানোর জন্য শুরু করেন সবজি চাষ। কিন্তু মাটি কাটার কাজ বন্ধ হয়ে গেলে আবারও অনিশ্চয়তায় আরজিনা। এ অবস্থায় কাজ পান আনসার-ভিডিপি’র খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে।

২০১৬ সালে এলাকার এক স্বেচ্ছাব্রতীর মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন আরজিনা। তার ভায়ায়, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানুষগুলোকে তার কাছে সমাজের অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা এবং আত্মপ্রত্যয়ী মনে হয়েছে। আরজিনা সিদ্ধান্ত নেন যেভাবেই হোক তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন। সে বছর তিনি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’

শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২১৬তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ আরজিনার জানার পরিধি বৃদ্ধি করে। তিনি সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য, সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণটি তাকে সমাজের বিপন্ন মানুষ বিশেষ করে নারীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে নারীনেত্রী আরজিনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রচেষ্টায় গঠিত নলুয়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে যুক্ত হন। এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করা, নারীদের অধিকার সচেতন করে তোলা এবং তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা যোগানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন তিনি। তার সাহসী নেতৃত্বে এলাকায় বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী আরজিনা খাতুন

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে আরজিনা তিন শতাধিক নারী-পুরুষকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে পেরেছেন। এছাড়া উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতন করছেন, নবজাতক ও মায়েদের টিকা গ্রহণ ও শিশুর জন্মনিবন্ধনের গুরুত্ব তুলে ধরছেন।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আরজিনা ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ‘জয়িতা পুরস্কার’ অর্জন করেন।

সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য আরজিনা খাতুন-এর প্রাপ্ত জয়িতা পুরস্কার

আরজিনা ব্যক্তিজীবনেও একজন সফল মানুষ। তিনি তার ছেলেকে এইচএসসি পাস করিয়েছেন। সে বর্তমানে ময়মনসিংহ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে গাড়িচালক হিসেবে

মাস্টার রোলে চাকরি করছে। আর মেয়ে বিএ পাস করে একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করছে। আর আরজিনা নিজে সংসার ও সামাজিক কাজের পাশাপাশি আনসার-ভিডিপি’র খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচন, কোনো উৎসব, কিংবা বিশেষ কাজে প্রয়োজন হলে তার ডাক পড়ে।

আরজিনা খাতুন জানান, তিনি জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ থেকে। তিনি মনে করেন, নারীরাও পারে। কিন্তু তা করে দেখানোর জন্য দরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, অদম্য মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম। আর এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে।

‘অতীতকে বিদায় জানাতে সাহস লাগে। সেই সাহস দেখাতে পারলে জীবন তোমাকে নতুন কিছু উপহার দেবে’

– পাওলো কোয়েলহো

স্বাস্থ্য সচেনতা বৃদ্ধিতে 'পুষ্টি আপা' রিপার অনন্য ভূমিকা

এ.এন.এম. নাজমুল হোসাইন

কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সদিচ্ছা থাকলে কোনো বাধাই যে বাধা হতে পারে না তার বাস্তব প্রমাণ নারীনেত্রী মোছা. ইন্নাত আরা রিপা। যিনি এলাকার নারীদের আশা-ভরসার প্রতীক, যিনি এলাকায় 'পুষ্টি আপা' নামে পরিচিত।

রিপার জন্ম ১৯৯২ সালের ২৮ অক্টোবর, ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের উজান ঘাগড়া গ্রামে। বাবা ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক। তাঁর দুই সংসারে ছিল চার পুত্র ও চার কন্যাসন্তান। দ্বিতীয় সংসারে রিপার সঙ্গে তার এক ভাই ছিলেন।

অভাব-অনটনের মধ্যেই কাটতে থাকে রিপার শৈশব। বাবার একক আয়ে সংসার ব্যয়ভার নির্বাহ করা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সংসারের বেহাল দশা কাটাতে তার মা হাসিনা বেগম ব্র্যাক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেন। মেয়ে রিপাকেও সেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তবে তার মায়ের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করাটা তার বাবা পছন্দ করতেন না। কিন্তু অভাবের দিকে তাকিয়ে তিনি বিষয়টা মেনে নেন।

স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ করছেন নারীনেত্রী ইন্নাত আরা রিপা

এক পর্যায়ে বাবার বাড়িতে থাকা শুরু করেন রিপার মা। সেখানকার স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন রিপা। তার মা সংসারের খরচ মেটানোর জন্য সেলাইয়ের কাজ করতেন।

এসএসসি পরীক্ষার আগে ২০০৮ সালে রিপার বিয়ে হয় মো. শাহিন মিয়ার সঙ্গে। যদিও শাহিনের মা বিয়েটা মেনে না নেওয়ার কারণে বিয়ের পরও রিপাকে মায়ের

কাছেই থাকতে হয়েছে। রিপার মা চাইতেন, মেয়ে লেখাপড়া করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক। মায়ের আন্তরিক সহযোগিতায় এসএসসি পাস করেন রিপা। ভর্তি হন একাদশ শ্রেণিতে।

২০০৯ সালে এক কন্যাসন্তানের মা হন রিপা। কিন্তু এ সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এভাবে দিন যায়, সংসার আর লেখাপড়া একসাথে। অসুস্থ শরীর নিয়েই এইচএসসি পরীক্ষা দেন রিপা। ইতিমধ্যে আবার গর্ভধারণ করেন রিপা। এবার পুত্রসন্তান জন্ম দেন তিনি। ঠিক সে সময় তার কিডনির সমস্যা ধরা পড়ে। মা এবং স্বামী তার পাশে দাঁড়ান, রিপাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার জানান, রিপার একটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই অপারেশন করে সেটি ফেলে দিতে হবে। তখন রিপা চরম হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু রিপার মা ও তার স্বামী তাকে সাহস যোগান। এরপর তার মেয়ের বয়স যখন আড়াই বছর, আর ছেলের বয়স দেড় বছর, তখন তার অপারেশন হয় এবং একটা কিডনি ফেলে দিতে হয়। তখন রিপা ভাবতে থাকেন তিনি আর কোনোদিন কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু রিপা ভেঙে পড়েননি। এখন শ্বশুরবাড়িতে থেকে সংসারের সকল কাজ ও সন্তানদের মানুষ করা– সব কাজ তিনি একাই সামাল দেন। তার মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রশিক্ষণ।

রিপার মা দীর্ঘদিন ধরে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রিপাও মায়ের সঙ্গে হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিভিন্ন সভায় যেতেন। রিপা স্বামীর অনুমতি নিয়ে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ থেকে তিনি আমাদের সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, সমাজের উন্নয়নে, নারীর উন্নয়নে তারও কিছু করার আছে।

'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের জীবনটাকে আরও গুছিয়ে নেন রিপা। সংসার কাজ শেষ হলেই যুক্ত হন সামাজিক কাজে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। রিপা জানান, তিনি এখন পর্যন্ত ৪২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেছেন, যে বৈঠকগুলোতে তিনি বাল্যবিবাহ, যৌতুক, জন্মনিবন্ধন, ইভটিজিং, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং মানুষকে সচেতন করে তুলেছেন। রিপার স্বামী এসব কাজে তাকে অনুপ্রেরণা যোগান, সহযোগিতা করেন।

রিপা ১১টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় দুইশত মানুষকে বাল্যবিবাহের ব্যাপারে সচেতন করতে পেরেছেন। ৬৫ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহযোগিতা করেছেন।

যৌতুক বিষয়ক ছয়টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রায় একশত মানুষকে সচেতন করতে পেরেছেন। নারী নির্যাতন বন্ধে উঠান বৈঠক করেছেন ১৩টি, যার মাধ্যমে প্রায় দুইশত মানুষ সচেতন হয়েছেন।

রিপা নিজে দুটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে আয়োজিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ স্থানীয় অনেক নারীকে যুক্ত করেছেন, যাদের মধ্যে ১৫ জন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

মাদার্স ক্লাবের মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী ইন্নাত আরা রিপা

একজন পুষ্টি উজ্জীবক হিসেবে রিপা বিভিন্ন মাদার্স ক্লাবে গিয়ে আটটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন, যে প্রশিক্ষণগুলোতে প্রায় ১ হাজার ৫০০ নারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেসব প্রশিক্ষণে শাক-সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি চাষ বিষয়ে আলোচনা করেন। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে অনেক নারী সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

রিপা এখন স্থানীয় নারীদের কাছে 'পুষ্টি আপা' নামে পরিচিত। এলাকার নারীরা বিপদ-আপদে যাকে কাছে পান তিনি হলেন ইন্নাত আরা রিপা।

রিপা এখন যা উপার্জন করেন তা দিয়ে নিজের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগান দিতে পারেন। এর মাধ্যমে নিজ সংসারেও বেড়েছে তার আত্মমর্যাদা। রিপা মনে করেন, চিন্তার ইতিবাচক পরিবর্তন হলে এবং একজন মানুষ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারলে তার এগিয়ে যাওয়ার পথে কোনো বাধাই বাধা হতে পারে না। আর এই শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে।

তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে নিবেদিত কণা আক্তার

পলাশ কান্তি পাল

কণা আক্তার। বঞ্চিত নারীদের এক ভরসার নাম। তার বিপ্লবী কন্ঠস্বর কথা বলে নিপীড়িত ও নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষের পক্ষে। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে তার রয়েছে অসামান্য ভূমিকা।

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন গুজাদিয়া। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর এই ইউনিয়নের আশুতিয়াপাড়া গ্রামে জন্ম কনার। তার বাবার নাম আব্দুল মান্নান, আর মায়ের নাম রাজিয়া খাতুন। ছয় ভাই ও তিন বোনের মধ্যে কনার অবস্থান অষ্টম।

ছোটবেলা থেকেই কণা একজন স্বাধীনচেতা ও পরোপকারী স্বভাবের মানুষ। সহপাঠীদের মাঝে তার খুব গ্রহণযোগ্যতা ছিল। লেখাপড়ার ব্যাপারেও কণার আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার লেখাপড়া খুব বেশি এগোয়নি। করিমগঞ্জ সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাসের পর ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একই ইউনিয়নের জঙ্গলবাড়ি গ্রামের মো. মনির উদ্দিনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়।

পারিবারিক শিক্ষা ও কলেজ জীবনের পরোপকারের অভিজ্ঞতাকে কণা তার শ্বশুরবাড়িতে কাজে লাগান। অন্য দশজন নারী থেকে তিনি সবসময় নিজেকে একটু এগিয়ে রাখেন তার সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক, সামাজিক যে কোনো কাজের দায়িত্ব নিতে তিনি সক্ষম– এ বোধ থেকে তিনি নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। বেশকিছু উপকার করে প্রতিবেশীদের আস্থা অর্জন করেন তিনি। যুক্ত হন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর প্রচেষ্টায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সঙ্গে।

২০২৩ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি (১৬২তম ব্যাচ) অংশগ্রহণের সুযোগ পান তিনি। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি তার আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

কণার শ্বশুরবাড়ির লোকজন নারীদের বাড়ির বাইরে গিয়ে কাজ করা পছন্দ করত না। কিন্তু স্বামী মনিরুল ইসলাম উজ্জীবক হওয়ায় কণা কিছুটা হলেও ঘর হতে বের হওয়ার সুযোগ পান।

এভাবেই ধীরে ধীরে সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হন কণা। বাল্যবিবাহমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তিনি অভিভাবকদের নিয়ে তার গ্রামে ২১টি উঠান বৈঠক ও সভা আয়োজন করেছেন। বাল্যবিবাহের খবর পেলে রাত কিংবা দিন নেই, তিনি ছুটে চলেন সে বাড়িতে। অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের কুফল বোঝানোর চেষ্টা করেন। এতেও কাজ না হলে তিনি প্রয়োজনে প্রশাসনের সাহায্য নেন। কণার মতো অন্য স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ কমে এসেছে জঙ্গলবাড়ি গ্রামে। কণা নিজে নয়টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। কণা এখন তার গ্রামে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার এক কণ্ঠ।

বৃক্ষরোপণ করছেন নারীনেত্রী কণা আক্তার

এখানেই তার দায়িত্ব শেষ নয়। এলাকার কিশোরীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা তা তিনি নিশ্চিত করেন। গর্ভবতী নারীদের যত্নের ব্যাপারে কণার রয়েছে খুব ভালো ধারণা। তাই কখনও একা, আবার কখনও দলগতভাবে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গর্ভবতী নারীদেরকে তিনি স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছেন। একাজে তিনি তৃপ্তি অনুভব করেন। কারণ তিনি জানেন একটি সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করলে সে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত হবে, আর ত্রুটিপূর্ণভাবে জন্ম নিলে সে সম্পদে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা, তাকে বোঝা মনে করবে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ। তাই গর্ভাবস্থায় মাকে সচেতন করতে পারলে মা এবং শিশু দু'জনেই সুস্থ থাকতে পারে।

কণা ইতিমধ্যে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্যবার্তা বিষয়ক ৭টি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন। এর মাধ্যমে ১৩৪ জন নারীকে স্বাস্থ্য সচেতন করতে পেরেছেন তিনি। গর্ভবতী নারীদের নিরাপদে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করেন কণা।

আত্মপ্রত্যয়ী সংগঠক মাসুদার সাফল্যগাঁথা

মো. হামিদুল ইসলাম

দুই পাশে দুটো টিনের কাঁচা ঘর, ঘরের পাশে রান্না করার টিনের চালা। বাড়ির আঙ্গিনায় কয়েক রকম ফলের গাছ। বাড়িতে ঢুকেই কানে পড়ল সেলাই মেশিনের শব্দ। বাড়িতে কেউ এসেছে এমন আন্দাজ করে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ৩০ বছর বয়সী এক নারী। খুবই অল্প লেখাপড়া জানা একজন নারী, যিনি শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই স্বাবলম্বী হয়েছেন, একইসঙ্গে সমাজের অন্য দরিদ্র নারীদের ভাগ্যের পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বলছি মাসুদা বেগমের কথা, যিনি এখন নওগাঁর পত্নীতলা ইউনিয়নের একজন সফল সংগঠক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু তার পরিচিতির পেছনে রয়েছে সংগ্রামী ইতিহাস।

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলা হতে চার কিলোমিটার দূরে পত্নীতলা ইউনিয়নের চকদুর্গারায়াম গ্রামে মানুষকে সংগঠিত করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সফল হয়েছেন মোছা. মাসুদা বেগম। তার জন্ম ১৯৭৭ সালে, মহাদেবপুর উপজেলার হাতুড় ইউনিয়নের মহিষবাথান গ্রামে। তার বাবার মোসলেম উদ্দিন ও মা মনোয়ার বেগম-এর পাঁচ কন্যা ও পাঁচ পুত্রের মধ্যে মাসুদার অবস্থান সপ্তম।

গণগবেষণা সমিতির অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারীনেত্রী মাসুদা বেগম

জীবনের রঙ্গিন স্বপ্নের ফুলগুলো পাপড়ি মেলতে না মেলতেই অষ্টম শ্রেণি পাসের পরই ১৯৯৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন মাসুদা। তার বিয়ে হয় একই গ্রামের ১৮ বছর বয়সী এক বেকার তরুণের সঙ্গে। জীবনের মানে বুঝে ওঠার আগেই পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত মাথায় পেতে নিয়ে এক অজানা সংসারে শরীক হতে হয় স্বামী আব্দুর রশিদের সঙ্গে। অনেক অজানা হতাশা উঁকি দেয় মাসুদার মনে।

পিতৃহারা স্বামীর সংসারে গিয়ে মাসুদা জানতে পারেন যে অনটনের সংসার চালাতে গিয়ে তার স্বামী আগেই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ৩৩ শতাংশ জমি বন্দক দিয়ে রেখেছেন। তাই

বাজার থেকে চাল কিনে আনার পরই চুলায় আগুন জ্বলত, রান্না হতো তাদের খাবার। কখনও কম খেয়ে, কখনও অর্ধাহারে দিন কাটতে থাকে মাসুদার। দারিদ্র্যের কষাঘাতে থমকে দাঁড়ায় তার জীবন।

বিয়ের এক বছর পর ১৯৯৫ সালে মাসুদার সংসারে আসে এক নতুন মুখ। জন্ম নেয় ফুটফুটে পুত্রসন্তান। স্বামীর সংসারের দুরবস্থার কথা বাবার বাড়িতে জানান তিনি। মেয়ের জীবনের কিঞ্চিৎ সুখের কথা ভেবে কন্যা দায়গ্রস্ত দরিদ্র বাবা বিশ হাজার টাকা তুলে দেন জামাতার হাতে। বাবার দেয়া টাকা পেয়ে অভাব ঘোচানোর নানা উপায় খুঁজতে থাকেন মাসুদার স্বামী। দশ হাজার টাকায় ৩৩ শতাংশ জমি বন্দক থেকে ছাড়িয়ে নেন। বাকি টাকায় অন্যদের কিছু আবাদি জমি বন্দক নিয়ে চাষাবাদ শুরু করেন। কাটতে থাকে সংসারের অভাব।

সময়ের ব্যবধানে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন মাসুদা। স্বামীর সংসারে শাশুড়ি ও দুই সন্তান-সহ পাঁচ সদস্যের পরিবার। এভাবে খাবারের মুখ যতই বেড়ে যায়, মাসুদার আশার স্বপ্নগুলো ততই ম্লান হতে থাকে। কীভাবে কেমন করে কেবল স্বামীর উপার্জনে পাঁচ সদস্যর সংসার চলবে সেই ভাবনা দিনরাত তাড়া করে বেড়ায় মাসুদার সরল মনকে। চোখের সামনে এতগুলো জীবন সংকটে পড়ে আছে, তার করার কিছুই নেই– এটাই শুধু তিনি জানেন। এভাবে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেন তার বাস্তব জীবন। কেটে যায় আরও কয়েকটি বছর।

স্যানিটেশন বিষয়ক প্রচারাভিযান পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী মাসুদা বেগম

২০১২ সালের আগস্ট মাসে মাসুদা তার ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আতাউর রহমান চৌধুরীর মাধ্যমে জানতে পারেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর প্রশিক্ষণের কথা। বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তিনি আলোহা মোবারকপুরে অনুষ্ঠিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৮৫তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। 'আমরা নারী, আমরা পারি,' 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি,'– এসব স্লোগান এবং নারীর অধিকার ও নারীর ক্ষমতায়ন

বিষয়ক আলোচনাগুলো তার মানসপটকে আন্দোলিত করে। তিনি নিজের মধ্যে এক ধরনের আত্মশক্তি অনুভব করেন। তিনি অনুভব করেন, তার পক্ষে সম্ভব নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

প্রশিক্ষণের পর মাসুদা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য টুপি সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। অল্প পরিমাণে কাঁথাও সেলাই করতে থাকেন তিনি। এভাবে টুপি ও কাঁথা সেলাই থেকে তিনি প্রতিমাসে প্রায় এক হাজার টাকা আয় করেন। সাংসারিক কাজের পাশাপাশি এই কাজ করতে তাকে অনেক বেশি সময় পরিশ্রম করতে হতো। নিজের লেখাপড়া না জানাটা যে তার উন্নতির জন্য কত বড় বাধা তা তিনি উপলব্ধি করেন। এভাবে পথ চলতে একই গ্রামের গণগবেষক রিক্তা রাণীর সহযোগিতায় দরিদ্র ও অসহায় নারীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন মাসুদা। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে গড়ে তোলেন 'চকদুর্গারায়াম নারী উন্নয়ন গণগবেষণা সমিতি'। সংগঠনের ৩০ জন সদস্যই নারী। প্রত্যেক সদস্য প্রতি মাসে ৫০ টাকা করে সঞ্চয় করেন। সমিতির বর্তমান তহবিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। সকলের মতামতের ভিত্তিতে মাসুদা সমিতির কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন।

গ্রাম উন্নয়ন দলের দ্বিমাসিক সভায় বক্তব্য রাখছেন নারীনেত্রী মাসুদা বেগম

উল্লেখ্য, পত্নীতলা ইউনিয়নে গণগবেষকদের উদ্যোগে প্রায় এগারটি সমিতি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে যে সমিতিগুলো অত্যন্ত সফল তার মধ্যে মাসুদার সমিতিটি অন্যতম। গণগবেষকদের উদ্যোগে আয়োজিত পত্নীতলা উপজেলার বিভিন্ন সমিতির বৈঠকে মাসুদা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। সমিতির প্রতিনিধি সভাগুলোতে মাসুদা প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। অন্যদের আলোচনা থেকে মাসুদা যেমন শিক্ষা নেন, তেমনি মাসুদার আলোচনা থেকেও অন্যরা উপকৃত হন।

গণগবেষণা সমিতি গড়ে তোলার কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। এজন্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়েই তাকে সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছে। মাসুদার মতে, সমিতি পর্যায়ে যদি সকলের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া যায়, সকলের মতামতের ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তবে সকলেই নিজেকে সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভাবেন।

তিনি জানান, সমিতির টাকা স্বল্প লাভে সদস্যদের মাঝে ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়, কিছু টাকা ব্যাংকে রাখা হয়। এ কারণে তার সমিতির সদস্যদেরকে এখন কোনো এনজিও বা মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয় না।

শুধু সঞ্চয় কিংবা ঋণ প্রদানকেই সদস্যরা সমিতির একমাত্র কাজ হিসেবে বিবেচনা করেন না। সমিতিতে নিয়মিত গণগবেষণার চর্চা হয়। সমিতির সভায় তারা প্রত্যেক সদস্যের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বসানো হয়েছে কিনা এবং সকল সদস্যের সন্তানেরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় কিনা সে খোঁজ নেওয়া হয়। গর্ভবতী নারী-সহ অন্যান্যরা যাতে কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা পায় সে লক্ষ্যে তারা এলাকার মানুষকে সচেতন করেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিকেও যোগাযোগ রাখেন। এছাড়া করোনার সময় এলাকার মানুষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তারা মাস্ক, সাবান ও খাবার বিতরণ-সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয়, সমিতির সদস্যরা তাদের ওয়ার্ডে ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত ওয়ার্ডসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্প নির্ধারণে মতামত দেওয়া-সহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সমিতির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাসুদা ২০১৪ সালে ৩০ জন নারীকে নিয়ে একটি সেলাই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। তিনি নিজেও ওই প্রশিক্ষণের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি কাপড় সেলাই শুরু করেন। বর্তমানে সেলাইয়ের কাজ করে তিনি প্রতিমাসে প্রায় তিন হাজার টাকা আয় করেন। তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে স্থানীয় আরও পাঁচজন নারী কাপড় সেলাই করে আয় করছেন।

সেলাই প্রশিক্ষণের পর মাসুদা ১৫ জন নারীকে নিয়ে আয়োজন করেন চারদিনের টুপি সেলাই প্রশিক্ষণ। ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই টুপি সেলাই করে মাসে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা আয় করছেন।

মাসুদার সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেখে স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা তাদের কমিটিতে মাসুদা বেগমকে সদস্য নির্বাচিত করেছে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পারিবারিক বিরোধ নিরোসন ও কল্যাণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছেন মাসুদা

মাসুদার ছেলে বিএ পাস করেছে। আর মেয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। মাসুদা সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান।

নারীনেত্রী মাসুদা বেগম বলেন, 'দরিদ্র মানুষেরা যদি নিজেদের ক্ষমতাকে বুঝতে পারে, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারে, নিজেদের কাজের সঙ্গে অন্যদের যুক্ত করতে পারে, নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে পরিবর্তন সম্ভব।'

মিনু আক্তার: একজন দক্ষ সংগঠক ও সমাজকর্মীর প্রতিচ্ছবি

মো. রেজাউল করিম

পরিবারের পাশাপাশি নিজ গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামরূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ও অদম্য শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন নারীনেত্রী মিনু আক্তার।

মিনুর জন্ম ১৯৯৪ সালে, নওগাঁর পত্মীতলার বাগমার গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। বাবার নাম আব্দুল হাকিম। তিনি ছিলেন স্থানীয় রাইচ রাইস মিলের কর্মচারী। আর মা মর্জিনা বেগম ছিলেন গৃহিণী। মিনুর বাবা-মা পুত্রসন্তানের আশায় চার কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পঞ্চশ সন্তান পুত্র হবে– এই আশা পোষণ করলেও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী পঞ্চম সন্তান হিসেবে পৃথিবীতে আসেন মিনু।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট আয়োজিত গণগবেষণা রিফ্লেকশন কর্মশালায় নারীনেত্রী মিনু আক্তার

মিনুর বাবার সামান্য আয়ে চলত সাত সদস্যের পরিবার। অভাবের কারণে বড় তিন বোনের কারো লেখাপড়া সুযোগ হয়নি। তাদের সবাইকেই অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। মিনুর চটপটে মনোভাব ও বুদ্ধিমত্তা দেখে বাবা পাঁচ বছর বয়সে তাকে বাগমার ব্র্যাকে ভর্তি করিয়ে দেন। এখান থেকে প্রাথমিকের পাঠ শেষে মিনু ভর্তি হন খিরসীন এস কে উচ্চ বিদ্যালয়ে। তার মা ধাত্রী হিসেবে কাজ করে এবং হাঁস-মুরগি পালন করে টাকা জমিয়ে মিনুর পড়ালেখার খরচ যোগাড় করতেন। মিনু দেখতে সুন্দর, লেখাপড়াতেও ভালো। এর পাশাপাশি তিনি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখান। ফলস্বরূপ অনেক পুরস্কারও অর্জন করেন তিনি। মিনুর লেখাপড়া চলতে থাকে, অন্যদিকে একের পর এক পাত্রপক্ষ মিনুকে দেখতে আসে। বাবা মেয়ের বিবাহ দিতে চাইলেও মিনু এবং তার মা কিছুতেই রাজি না। মিনু লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহের কথা জানায় বাবাকে। ফলে লেখাপড়া চলতে থাকে মিনুর।

মিনু তখন দশম শ্রেণির ছাত্রী। ঘোষনগর ইউনিয়নের নোধূনী গ্রামের দেওয়ানপাড়ার আবু বক্কর সিদ্দিক-এর পক্ষ থেকে মিনুর বিয়ের প্রস্তাব আসে। বাবা রাজি থাকলেও মিনু ও তার মা রাজি হয় না। কিন্তু পাত্রপক্ষের পীড়াপিড়িতে এক পর্যায়ে মা-বাবা বিয়েতে রাজি হন। কিন্তু মিনু বিয়েতে রাজি নয়। তখন মা-বাবার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে শর্তসাপেক্ষে বিয়েতে রাজি হন তিনি। শর্ত হলো এসএসসি পরীক্ষার পর বিয়ের অনুষ্ঠান হবে এবং বিয়ের পরও তার লেখাপড়া চালিয়ে নিতে হবে।

শিশু শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার গুরুত্ব বোঝাচ্ছেন নারীনেত্রী মিনু আক্তার

শর্তানুযায়ী আবু বক্কর সিদ্দিক-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু স্বামীর সংসারে এসেও মিনু সেই চিরাচরিত অভাবের দেখা পান। কিন্তু তিনি লেখাপড়া ছেড়ে দেননি। উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে মিনু ও তার স্বামী লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। মিনুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করে।

মিনু সংসারের আয় বাড়াতে গাভি, কবুতর ও হাঁস-মুরগি পালন করেন। তিনি এখন নোধুনী ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা, আর স্বামী আবু বক্কর সিদ্দিক একটি কিটনাশক কোম্পানির মার্কেটিং অফিসার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাদের একমাত্র পুত্রসন্তান তৃতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করছে।

মিনু আক্তার ২০১৫ সালে রাজশাহী পোস্টাল একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ‘নারী নেতৃত্ব বিকাশ’ শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (২০১তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণের পর তিনি স্থানীয় দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে গণগবেষক বেবী সুলতানার সহযোগিতায় ‘বাগমার শাপলা গণগবেষণা সমিতি’ নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৩ জন। সমিতির বর্তমান সঞ্চয় ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬০ টাকা। নজিপুর মার্কেন্টাইল ব্যাংকে সমিতির যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। মিনু আক্তার সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। করোনার সময় সমিতির সদস্যদের পরিবারের ভরণ-পোষণ মেটাতে ২৩ জন সদস্যের মাঝে

এককালীন ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য সহজ শর্তে সমিতি থেকে গ্রামের ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ প্রদান করা হয়। সমিতি ঋণ নিয়ে অনেক নারী-পুরুষ স্বাবলম্বী হয়েছেন। এছাড়া সমিতি থেকে গ্রামের অস্বচ্ছল দুটি পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বাবদ কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছে।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ফলো-আপ সভায় প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সেশন পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী মিনু আক্তার

মিনু আক্তার ঘোষনগর ইউনিয়ন গণগবেষণা ফোরামের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নারীদের দক্ষ করে তুলতে ২০ জন নারীকে সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন মিনু। দক্ষতার কারণে এদের মধ্যে যৌতুক ছাড়াই দু'জন নারীর বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

মিনু আক্তার বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ-সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিগত দু বছরে ৬০ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন, ঝরেপড়া ১১জন শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়গামী করেছেন, পাঁচজন কন্যাশিশুর বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করেছেন, পরিবারিক নারী নির্যাতন বন্ধ করেছেন দুটি। এছাড়া যৌতুক প্রতিরোধে পাঁচটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেছেন মিনু।

২০১৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর এর সহযোগিতায় ঘোষনগর ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে আয়োজিত দু দিনব্যাপী 'প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন মিনু আক্তার। পরবর্তীতে তিনি পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বার্তার একজন সহায়ক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছেন। করোনাভাইরাস প্রতিরোধের

লক্ষ্যে স্থানীয় স্বেচ্ছাব্রতীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলেছেন মিনু আক্তার। তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিষয়ভিত্তিক উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও নিরাপদ পানি ব্যবহার সম্পর্কেও স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলছেন। এসব কারণে মিনু আক্তার অন্য সব নারীদের জন্য হয়ে ওঠছেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন মিনু আক্তার (বামে দাঁড়ানো)

নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে মিনু আক্তার জানান, তিনি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজগুলোকে আরও ত্বরান্বিত করতে চান। নোধূনী গ্রামকে নিরক্ষরমুক্ত, বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তিনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে চান। এছাড়া নিজের সন্তানকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি।

“সদিচ্ছা নিয়ে যারা কাজে নামেন,
তাদের কাছে কোনো কাজই অসম্ভব বলে মনে হবে না।”
– জন হেউড

তৌফিকা বানু এখন প্রতিষ্ঠিত নারী

মো. খোরশেদ আলম

প্রত্যেক মানুষের বিশেষ কিছু যোগ্যতা থাকে, থাকে ইচ্ছাশক্তি কিংবা আত্মশক্তি। সেই আত্মশক্তির সঙ্গে পরিশ্রম যুক্ত করে যে কেউ হতে পারেন স্বাবলম্বী। অবদান রাখতে পারেন নিজ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে। নিজ প্রতিভা ও আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এভাবেই স্বাবলম্বী হয়েছেন নারীনেত্রী তৌফিকা বানু।

তৌফিকা ১৯৭৮ সালের ২৬ জুন তারিখে নজিপুর গার্লস স্কুলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম প্রয়াত ডা. কাছির উদ্দিন, আর মা প্রয়াত উম্মে কুলসুম।

দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় ১৯৯৩ সালের ০৮ জুন পারিবারিক সিদ্ধান্তে তার বিয়ে হয় মাটিন্দর ইউনিয়নের সুরহট্টি দরগাপাড়া গ্রামের সোলাইমান আলীর সঙ্গে। বিয়ের পরও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যান। তিনি ১৯৯৪ সালে নজিপুর গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৯৯ সালে শিবপুর চৌরাট বরেন্দ্র ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। এরপর দু সন্তানের জন্মের কারণে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৯৯৯ সালে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক প্যারামেডিকস কলেজ থেকে ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করেন।

নিজ বাড়িতে কাপড় সেলাইয়ের কাজ করছেন নারীনেত্রী তৌফিকা বানু

তৌফিকার স্বামী একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। স্থানীয় শিবপুর বাজারে চেম্বার রয়েছে তার। স্বামীর একক উপার্জনে চারজনের সংসার চালাতে ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে হিমশিম খেতে হত তৌফিকাকে। তৌফিকা নিজে কিছু করে সংসারে

সহযোগিতা করতে চান। তিনি স্বামীর মতো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কিন্তু নানা রকমের সমস্যার কারণে তা হয়ে ওঠে না।

তৌফিকা সুরহট্টি মোল্লাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) একজন সক্রিয় সদস্য। তিনি নিয়মিত ভিডিটির সভায় উপস্থিত থাকেন। ভিডিটির সভায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোহাম্মদ খোরশেদ আলম জানান, বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর আয়োজনে বগুড়ায় তিনদিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (১২১তম ব্যাচ) অনুষ্ঠিত হবে। তৌফিকা উক্ত প্রশিক্ষণ অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তৌফিকা সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধরন, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও নারী নেতৃত্ব বিকাশে করণীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।

প্রশিক্ষণ শেষে তৌফিকা উপলব্ধি করেন, তার মধ্যে অনেক লুকায়িত প্রতিভা আছে। আর তা কাজে লাগাতে পারলে তিনি স্বাবলম্বী হতে পারবেন। পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধ থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কিছু করারও স্বপ্ন দেখা শুরু করেন তৌফিকা।

হোমিও চিকিৎসক হিসেবে রোগীদের সেবা দিচ্ছেন নারীনেত্রী তৌফিকা বানু

এর কিছুদিন পর দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় মাটিন্দর ইউনিয়ন পরিষদে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ক তিন মাসব্যাপী এক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন তৌফিকা। সফলতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ শেষ করে নিজ বাড়িতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন তিনি। সেলাইয়ের কাজ করে প্রতিমাসে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আয় করতে থাকে তার।

তৌফিকা সেলাই থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে হোমিওপ্যাথির ওপর ডিগ্রি নেওয়ার আগ্রহের কথা জানান তার স্বামীকে। স্বামী তার আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখান।

হোমিওপ্যাথির ওপর ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার অনুশীলন শুরু করেন তৌফিকা। এক

পর্যায়ে কাপড় সেলাইয়ের পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন তিনি। প্রথমদিকে এলাকার দরিদ্র ও আদিবাসী মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতেন তৌফিকা। একসময় তৌফিকা এলাকার মানুষের কাছে তাদের প্রিয় আস্থাভাজন ডাক্তার হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

তৌফিকা এখানেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। এলাকার মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মাটিন্দর ইউনিয়ন পরিষদের ৪, ৫ ও ৬নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন। জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার পর বড় পরিসরে এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ হয় তৌফিকার। কখনও পরিষদের মাধ্যমে, কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি পিছিয়ে পড়া মানুষের খুব কাছ থেকে সেবা প্রদান করতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি শিবপুর বাজারে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হিসেবে মানুষকে চিকিৎসা সেবা, বিশেষ করে দরিদ্র ও অসহায় গর্ভবতী নারীদের স্বাভাবিক প্রসব সংক্রান্ত সেবা দিয়ে থাকেন।

নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ করছেন নারীনেত্রী তৌফিকা বানু

এতসব কাজের পাশাপাশি তৌফিকা নিজে বাড়িতে শাক-সবজি চাষ করে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বাজারে বিক্রি করেন। বর্তমানে তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পুষ্টি উজ্জীবক হিসেবে কাজ করছেন। তৌফিকা দক্ষিণ রামপুর, সিংহন্দী, ও বাজকোলা মাদার্স ক্লাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও গর্ভবতী নারীদের সেবা, শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা ও বাগান করা ইত্যাদি সেবা দিয়ে আসছেন।

নিজ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা তৌফিকা এখন একজন প্রতিষ্ঠিত নারী। তার বড় ছেলে মাস্টার্স পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। ছোট ছেলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ছে।

তৌফিকা নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে শিবপুর বাজারে প্রধান সড়ক সংলগ্ন ২২ শতক জমি ক্রয় করেছেন। সেখানে স্বামীকে সঙ্গে বাড়ি করেছেন। ভবিষ্যতে বাড়ির সামনে একটি মার্কেট করার চিন্তা আছে তৌফিকার। যে মার্কেটে থাকবে তার নিজস্ব হোমিও চেম্বার।

স্থানীয় নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করা এবং চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন নারীনেত্রী তৌফিকা বানু

তৌফিকা বানুর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মাটিন্দর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুলতান মাহমুদ বলেন, 'তৌফিকা বানু আমাদের সামনে এক জ্বলন্ত নক্ষত্র। তার আলো এতটাই প্রখর যে তিনি সব জায়গায় সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন। একটি রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন সভাপতি হিসেবেও তার অনেক সুনাম আছে। তিনি সত্যিই একজন সফল মা, জনগণের সেবক এবং সফল নারীনেত্রী। আমি মনে করি, তাকে অনুসরণ করে এলাকার সকল নারীর এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে নারীরা আর পিছিয়ে থাকবে না। বরং নারী-পুরুষের সমতার বন্ধন অটুট থাকবে।'

"সদিচ্ছা নিয়ে যারা কাজে নামেন,
তাদের কাছে কোনো কাজই অসম্ভব বলে মনে হবে না।"
– জন হেউড

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রাণসঞ্চারী মানুষ ‘খাদিজা আপা’

অজিবর রহমান লেবু

সমাজের বেশিরভাগ মানুষই জীবন চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হলে কিংবা পরাজিত হলে অন্যের কাঁধে দায়ভার চাপিয়ে দিতে চান। কিন্তু যারা বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে অর্থপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে পথ চলেন, তারাই অসাধারণ জীবনের অধিকারী। অন্যেরা তাকে দেখে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায়। এমনই এক অনুপ্রেরণার উৎস ও প্রাণসঞ্চারী মানুষ খাদিজা আক্তার। যিনি জীবনযুদ্ধে চলার শুরুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, থমকে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু থেমে যাননি।

নীলফামারী জেলা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরে ভারতের সীমান্তবর্তী প্রমত্তা তিস্তার কোলঘেঁষে ডিমলা উপজেলার অবস্থান। এই উপজেলার খালিশাচাপানী ইউনিয়নের ডালিয়া গ্রামের বাসিন্দা নারীনেত্রী খাদিজা আক্তার। ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি খাদিজার জন্ম। বাবা সাইদুল ইসলাম ও মা মোয়ারজেমা বেগমের তিন সন্তানের মধ্যে খাদিজা দ্বিতীয়।

শৈশবে গ্রামের নির্মল উন্মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠতে থাকেন খাদিজা। শিক্ষায় হাতেখড়ি স্থানীয় মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিকের পর্ব শেষে তিনি চৌধুরী পাড়া দাখিল মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় মাত্র ১৫ বছর বয়সে একই উপজেলার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডালিয়া গ্রামের জুয়েল ইসলামের সঙ্গে খাদিজার বিয়ে হয়ে যায়। খাদিজার বাবা সাইদুল ইসলাম ছিলেন পেশায় একজন ক্ষুদ্র কৃষক। তাঁর সীমিত আয়ে সন্তানের এবং পরিবারটির ভরণ-পোষণ ও লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব ছিল। তাই মেধা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও খাদিজার স্বামী জুয়েল ইসলাম-এর আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হওয়ায় খাদিজা আক্তারকে বাল্যবিয়ে দিতে বাধ্য হন তার বাবা-মা।
তবে বিয়ের পরেও খাদিজা লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন, ভর্তি হন ছোটখাতা আলিম মাদরাসায়। সেখান থেকে ২০১৪ সালে দাখিল পাস করেন। স্বামীর সংসারে এসে

শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ননদ-দেবরদের ভালোই মানিয়ে নিয়েছিলেন খাদিজা আক্তার। তাছাড়া অল্পদিনের মধ্যে স্বামীর একজন ভালো বন্ধু হয়ে ওঠতে পেরেছিলেন তিনি। এভাবে বেশ আনন্দেই তাদের দিন চলতে থাকে।

বিয়ের দু বছরের মাথায় খাদিজা আক্তারের কোল আলো করে জন্ম নেয় তাদের প্রথম কন্যাসন্তান। খাদিজা বাল্যকাল থেকেই ছিলেন প্রতিবাদী ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী এক নারী। নিজ অবস্থান থেকে অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতেন, কখন কখনও করতেন প্রতিবাদ। একবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড় খেলায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য খাদিজা একদল ছাত্রীকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন করেন। ছাত্রীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রধান শিক্ষক মেয়েদেরকেও দৌড় খেলার ব্যবস্থা করে দেন। খাদিজা আক্তারের মনে হতো, নারীরা কেন শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। তাদেরও ছেলেদের মতো চলা-ফেরার স্বাধীনতা থাকা দরকার।

সময়ের পরিক্রমায় খাদিজা আরও এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। দুই সন্তানের জননী খাদিজ আক্তার গ্রামের অন্য নারীদের মতো ঘরের চার দেয়ালে বন্দি হয়ে থাকেননি। তিনি সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তার দায়িত্ব ছিল ঝরেপড়া শিশুদের লেখাপড়া করানো। এলাকার কোনো শিশু যাতে লেখাপড়া থেকে বাদ না পড়েন তাও খাদিজা আক্তার নিশ্চিত করেন।

নারীদের জন্য কাজ করতে গিয়ে তার বিভিন্ন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। নারীদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চনা তাকে পীড়া দিত। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা তাকে খুব কষ্ট দিত। এ সময় খাদিজা আক্তার বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। নারীদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। এসব করতে গিয়ে তিনি স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমালোচনার মুখে পড়েন। এতে খাদিজার সঙ্গে তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের দূরত্ব বাড়তে থাকে।

২০১২ সালে খাদিজা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণে (১৮৯৩তম ব্যাচ) অংশ নেন। উক্ত প্রশিক্ষণে দশ নীতির আলোচনা তাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে। এতে করে নতুন পথের দিশা পান তিনি। প্রশিক্ষণের পর থেকে তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের জন্য প্রচারভিযান কর্মসূচির আয়োজন করেন এবং প্রচারাভিযানে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে এবং শিশুদের বিদ্যালয়গামী করতে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। খাদিজা আক্তার তার গ্রামে ১৪টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তার এলাকার ২০ জন ঝরে পড়া শিশুকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে সক্ষম হন।

সামাজিক কাজের পাশাপাশি তিনি স্থানীয় একটি কিন্ডার গার্ডেনে নামমাত্র বেতনে শিক্ষকতার কাজ নেন। এলাকাবাসীর কাছে তিনি এখন 'খাদিজা আপা' নামেই পরিচিত এক মুখ।

২০১৪ সালে রংপুরের তিলোত্তমা কমিউনিটি সেন্টারে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১৫৪তম ব্যাচে) অংশগ্রহণ করেন খাদিজা। তিনদিনের এই প্রশিক্ষণ তার জানা ও বোঝার পরিধি আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে। নারীদের উন্নয়নে কাজ করার জন্য খাদিজা নতুনভাবে নিজেকে শাণিত করেন।

প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবার্তা বিষয়ক উঠান বৈঠক পরিচালনা করছেন উজ্জীবক ও নারীনেত্রী খাদিজা আক্তার

প্রশিক্ষণের পর এলাকায় ফিরে খাদিজা নারীদের সংগঠিত করতে থাকেন। ৩০ জন নারীকে নিয়ে গঠন করেন 'নারী কল্যাণ গণগবেষণা মহিলা সমিতি'। সমিতির সদস্যরা খাদিজা আক্তারকে এই সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করেন। বর্তমানে সমিতির পুঁজি দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা।

অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সংগঠন গড়ে তোলার পাশাপাশি খাদিজা আক্তার এলাকার নারীদেরকে তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলেছেন। তিনি এখন পর্যন্ত ৩০ জন শিশুর জন্মনিবন্ধন, ১২ অসহায় নারীকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন সরকারি সেবা পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেছেন। নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টায় তিনি নিয়মিত নারীদের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগান।

খাদিজা আক্তার বলেন, 'নিজে একা ভালোভাবে বেঁচে থাকার নাম জীবন নয়। এলাকার সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে সুখে-দুঃখে চলাই সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা। সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে মানুষকে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাই, আসুন, প্রথমে নিজেকে জয় করি'।

প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে সফল নারীনেত্রী সন্ধ্যা রাণী সরকার

চন্দ্রশেখর রায়

জীবন যুদ্ধে অবিচল থেকে সফলতা অর্জন করা অদম্য এক নারীনেত্রীর নাম সন্ধ্যা রাণী সরকার। গ্রাম বাংলার অন্য নারীদের মতো তার জীবন অতোটা সহজ ছিল না। পিত্রালয় থেকে শ্বশুরবাড়ি প্রতিনিয়ত শত প্রতিবন্ধকতা আর চারিদিক থেকে অবহেলার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি কখনও কখনও থমকে গেলেও দমে যাননি, সফলতা ছিনিয়ে এনেছেন নিজ মেধা ও পরিশ্রমকে কাজ লাগিয়ে।

সন্ধ্যা রাণী সরকার-এর জন্ম ১৯৬৩ সালে ৪ মে, রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পুটিমারী গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। বাবা হরিপদ সরকার, আর মা কুমুদিনী সরকারের দুই পুত্র ও সাত কন্যার মধ্যে সন্ধ্যা সবার বড়। মা-বাবার অধিক সন্তানের মাঝে মেয়ে হিসেবে তিনি বরাবরই বঞ্চনা ও অবহেলার মধ্যে বেড়ে ওঠতে থাকেন।

শৈশব থেকেই সন্ধ্যা ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং শান্ত স্বভাবের। লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি বাবার সঙ্গে জমিতে কৃষিকাজ করতেন। হস্তশিল্পের কাজে ছিল তার দারুণ আগ্রহ।

নয় সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন তার বাবার মাথার উপরে ছিল বিপদাপন্ন দুশ্চিন্তার পাহাড়। সে কারণে বাবা ছিলেন অনেক কঠিন ও হিসাবী মানুষ। তবে মায়ের সহযোগিতায় লেখাপড়া চালিয়ে যান সন্ধ্যা। স্থানীয় বৈরাতী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে মানবিক বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করেন তিনি। কলেজে পড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও অভাবের কারণে সেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ১৭ বছর বয়সে বাবা তার বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮১ সালে রংপুর সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়নের উত্তর খলেয়া সরকার পাড়া গ্রামের অশ্বিনী কুমার সরকারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে স্বামী অশ্বিনী কুমার সরকার তৃতীয়। শ্বশুর শ্বাশুড়ি ও সন্ধ্যা রাণী-সহ এগারো সদস্যের যৌথ পরিবার। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস অশ্বিনী কুমার সরকার তখন বেকার। বিয়ের পরে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি সন্ধ্যা রাণীকে বেশ আদর করতেন। পেশায় গ্রাম্য ডাক্তার শ্বশুর নারী রোগীদেরকে ইনজেকশন পুশ করার জন্য ছেলের বৌ সন্ধ্যা রাণীকে দক্ষ করে তোলেন। কিন্তু

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সন্ধ্যা রাণীর প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ির এই আন্তরিকতা সহজভাবে দেখতেন না।

বিয়ের চার মাস পর সন্ধ্যা রাণী সরকার তখন বাবার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে জানতে পারলেন তার শ্বশুরের সিদ্ধান্তে কেবল সাত মন ধান এবং ৫০ শতক জমি বর্গা হিসেবে চাষ করতে দিয়ে তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছেন তিনি। সন্ধ্যা রাণী নিরুপায় হয়েই পৃথকভাবে সংসার চালানোর বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনবেলার জায়গায় দু বেলা, কখনো কম খেয়ে, কখনো বা না খেয়েই চলতো তার নতুন সংসার। স্বামী তখনো আয় রোজগারহীন, টেনেটুনে কোনোমতে চলে তাদের প্রতিটি দিন।

বিয়ের তিন বছর পর ১৯৮৪ সালে প্রথম কন্যাসন্তান কাকুলি সরকারের জন্ম দেন সন্ধ্যা রাণী। অনটনের সংসারে সন্তানের জন্য শুরু হলো বাড়তি খরচ। এলাকার কৃষি জমিতে সেচ দেওয়ার ডিপকল চালানোর ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন তার স্বামী অশ্বিনী কুমার সরকার। স্বামীর খরচের হাত খুবই লম্বা। ফলে ডিপের ম্যানেজার হিসাবে যে ক'টা টাকা রোজগার হতো, তা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চা-পানের খরচে চলে যেতো।

মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করছেন নারীনেত্রী সন্ধ্যা রাণী সরকার

স্বামীর অপব্যয়ের বিষয়টা ভাবিয়ে তুলতো সন্ধ্যা রাণীকে। অনটনের সংসারের চাহিদা পূরণের কথা চিন্তা করে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকার কাজ নেন তিনি। এতে কিছুটা হলেও তখনকার দিনে সংসারের ছোট ছোট চাহিদাগুলো মেটাতে পারতেন সন্ধ্যা রাণী। তার দায়িত্ববোধ এবং পড়ানোর দক্ষতা দেখে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ তাকে আরও একটি স্কুলের দায়িত্ব দেয়। সকাল-বিকাল, দুবেলা দুটো স্কুল চালিয়ে তিনি মাসে ৬০০ টাকা বেতন পেতেন। সারাদিন নিজের তিন বছরের সন্তান সামলিয়ে শিশুদের পড়ানো, সংসারের কাজ গোছানোর ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে চলে যেতো তার দিন। জীবনকে স্বাভাবিক অবস্থানে রাখার জন্য এক সহজ সরলা নারীর জীবনে শুরু

হয় বিরতিহীন ঘোড়দৌড়। এভাবে কেটে যায় পাঁচ বছর। এরপর জন্ম হয় দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের। অধিক পরিশ্রম আর অবহেলার কারণে জন্মের কয়েকদিন পরই মারা যায় দ্বিতীয় সন্তান। ভেঙে পড়া শরীর ও মন নিয়েই আবার শুরু হয় তার টিকে থাকার লড়াই। এমনি করে কখন যে তার দাম্পত্য জীবনের তেরটি বছর কেটে গেছে তিনি বুঝতেই পারেননি। তার সামান্য উপার্জনে মেয়ের লেখাপড়া ও সংসারের খরচ চালিয়ে কোনোমতে নিভু নিভু করে জ্বলছিল তাদের সংসার প্রদীপ। এবার ছেলেসন্তানের জন্ম দিয়ে তৃতীয়বার মা হলেন সন্ধ্যা রাণী। বেড়ে যায় সংসারের ব্যয়ের পরিধি।

সন্ধ্যা রাণী সরকার নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। এমন সংকটময় পরিস্থিতি, তার সন্তানদের জীবনে কখনো দেখতে চান না তিনি। সেজন্য সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেন। দেখা যায়, সন্তানদের লেখাপড়ার পেছনে তার আয়ের বেশিরভাগ খরচ হয়ে যেত। এরই মাঝে স্বামী ডিপকলের ম্যানেজারের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কেবল বাবার দেওয়া বর্গা জমির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। স্বামীর বাড়তি আয়ের উপায় না থাকাটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে, তাদের পেছনে লেখাপড়ার ব্যয়ও বাড়ছে। যদি কখনও সন্ধ্যা রাণীর শিক্ষা প্রোগ্রামের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় তখন কী হবে? সেজন্য পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মতির বিরুদ্ধে গিয়ে স্বামীকে বুঝিয়ে তার জন্য গ্রাম পুলিশের চাকরির ব্যবস্থা করেন সন্ধ্যা রাণী। কিন্তু স্বামীর মানুষের পেছনে খরচ করার অভ্যাস পাল্টাতে পারেননি। তাই স্বামীর চাকরির কারণে সংসারের খুব উন্নতি হয়নি। তাই সন্ধ্যা রাণীর একটাই ভাবনা, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে আরও অনেক সংগ্রাম করতে হবে। এদিকে ব্র্যাকের স্কুল প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যায়, আর সন্ধ্যা রাণীও হয়ে পড়েন কর্মহীন, বন্ধ হয়ে যায় তার নিজস্ব আয়-উপার্জন। এখন আর আগের মতো ব্যস্ততা নেই। গতিময় জীবন যেন লক্ষ্যে পৌঁছার আগেই হঠাৎ থেমে গেল। সংসার জীবনে ২৩ বছরের পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সন্ধ্যা রাণী বড় ক্লান্ত। আর্থিক সংকটে হতাশা আর দুর্ভাবনা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় তার মানসিক শক্তি মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে। কী করবে, কোথায় যাবেন– সেই ভাবনা তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায়।

ঠিক সেই সময় ২০১৩ সালে স্থানীয় ইউপি সদস্যের মাধ্যমে সন্ধ্যা রাণী জানতে পারেন 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে নারীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। তিনি উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহের কথা জানান এবং তিন দিনব্যাপী 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১২৯তম ব্যাচ) অংশগ্রহণ করেন। 'নারীরাই ক্ষুধামুক্তির মূল চাবিকাঠি'– প্রশিক্ষণের এই স্লোগানটি তার মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি করে। একইসঙ্গে 'আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনও দরিদ্র থাকতে পারে না'–

এই বাক্যটিও জীবনযুদ্ধে তাকে ঘুরে দাঁড়াতে অনুপ্রেরণা যোগায়। সন্ধ্যা রালী বলেন, 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণটি যেন আমার মাঝে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া আত্মশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসকে পুনরুদ্ধার করে দেয়।'

প্রশিক্ষণের পর সন্ধ্যা রাণী নিজের গ্রামের নারীদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। কারন তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীদের সচেতন ও সংগঠিত করতে না পারলে নারীদের মুক্তি কোনোভাবেই আসবে না। গ্রামের নারীদের নানান সমস্যা সমাধানে পরামর্শ দেন তিনি। নানানভাবে তিনি অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, মেয়েরা পরিবারের বোঝা নয়, বরং মেয়েদেরকে যোগ্য করে গড়ে ওঠার সুযোগ দিলে তারাও পরিবার তথা সমাজের দায়িত্ব নিতে পারে। সন্ধ্যা রাণী নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাবলম্বী করার পরে বিয়ে দিয়ে সমাজের মানুষের ধারণা বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী সন্ধ্যা রাণী সরকার

২০১৬ সালে সন্ধ্যা রাণী গ্রামের ২০ জন নারীকে সংগঠিত করে 'শ্যামলী গণগবেষণা সমিতি' গড়ে তোলেন। সংগঠনের বর্তমান তহবিল ৮ হাজার টাকা। তিনি এই সংগঠনের সভায় সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং এসব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলেন। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সদস্যদের পরিবারগুলোতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, নিরাপদ মাতৃত্ব, জন্মনিবন্ধন, শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করছেন, নির্যাতন ও বাল্যবিবাহমুক্ত পরিবার গঠনের চেষ্টা করছেন এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলছেন। ফলে গ্রামের বাকি পরিবারগুলোতে এই সচেতনতা ছড়িয়ে পড়ছে।

সন্ধ্যা রাণীর এসব সামাজিক কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে তার গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা দু'টোই বেড়েছে। তিনি বর্তমানে উত্তর পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দলের (ভিডিটি) সাধারণ সম্পাদক এবং খলেয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মিস্ত্রিপাড়া, হাজী পাড়া ও সরকার পাড়া এই তিন পাড়ার নারী-পুরুষ যেকোনো সমস্যায় তার কাছে পরামর্শ চাইতে আসেন।

সন্ধ্যা রাণী এখন একজন নিবেদিত সমাজকর্মী। পারিবারিক জীবনেও তিনি একজন সফল নারী ও গর্বিত মাতা। প্রথম সন্তান কাকুলী সরকার (৩৮) বাংলাদেশ পুলিশে চাকরি করে। তার স্বামীও একজন পুলিশ অফিসার। দ্বিতীয় সন্তান উত্তম সরকারও পুলিশ বিভাগে চাকরি করছে। মা-ছেলে মিলে বানিয়েছেন তিনতলা বাড়ি।

সন্ধ্যা রাণী সরকার বলেন, 'একজন মানুষ সচেতন হলে, তার পক্ষে নিজের এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।' তিনি স্বপ্ন দেখেন, তার মতো স্বেচ্ছাব্রতী নারীদের হাত দিয়ে শুরু হওয়া গ্রামের মানুষের সার্বিক পরিবর্তন একদিন পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

"কোনো দেশের অবস্থা দেশের নারীর জাতির অবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয়।"
– পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

জীবনযুদ্ধে জয়ী উজ্জীবক তাহমিনা বেগম

মো. মোজাম্মেল হক

শুধু নিজের সন্তান লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হবে, পরিবার ও সমাজের মুখ উজ্জল করবে, এমনটি না ভেবে এলাকার সকল ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়গামী হবে, অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও লেখাপড়ার সুযোগ পাবে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে এলাকা মুক্ত হবে, এলাকায় মাদকমুক্ত পাঠক সমাজ গড়ে ওঠবে– এমন স্বপ্নের বাস্তবায়নে কাজ করছেন উজ্জীবক তাহমিনা বেগম। তাহমিনা বেগম তার স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা ও নির্দেশনা পান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে।

তাহমিনা ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ উপজেলার ভিমখালী ইউনিয়নের নোয়াগাঁও চান্দের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ইফসুফ আলী পেশায় একজন কৃষক। আর মা জরিনা বেগম একজন গৃহিণী। চার ভাই-বোনের মধ্যে তাহমিনা ছিলেন বাবা-মায়ের দ্বিতীয় সন্তান।

প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তাহমিনা। কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পাস করেন তিনি। কিন্তু বাবার অভাবের সংসারে তার বেশিদূর লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই ১৮ বছর বয়সে জামালগঞ্জ সদরের নতুনপাড়া নিবাসী স্কুল শিক্ষক আরশাদ আলীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় তাহমিনাকে। রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তার।

শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক লিফলেট বিতরণ করছেন উজ্জীবক তাহমিনা বেগম

সময়ের ব্যবধানে তিন কন্যাসন্তানের মা হন তাহমিনা। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে তার। এক পর্যায়ে তিনি বাধ্য হয়ে স্বামী-সংসার ছেড়ে পৃথক জীবনযাপন শুরু করেন। তাহমিনার জীবনে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। একদিকে তিন সন্তানের ভরণ-পোষণ, অন্যদিকে তাদের লেখাপড়ার খরচ– এই দুয়ে মিলে তাকে হিমশিম খেতে হয়। উপায় খুঁজতে থাকেন প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার।

২০০৪ সালে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হন তাহমিনা। তিনি ঝরেপড়া ৫২ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একদিকে যেমন এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন, অন্যদিকে তেমনি সংসারের ব্যয় নির্বাহের কিছুটা উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন।

২০১৯ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মো. সাইফুল্লাহ-এর আমন্ত্রণে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন তাহমিনা। চারদিনের এই প্রশিক্ষণ তাহমিনার সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। এই প্রশিক্ষণে নাগরিক হিসেবে একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনা, জ্ঞানের রাজ্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের আলোচনাগুলো তাহমিনার মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে।

গ্রামের নারীদের স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তুলছেন উজ্জীবক তাহমিনা বেগম

প্রশিক্ষণের পর নানাবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত হন তাহমিনা। কোভিড-১৯ মহামারি শুরুর পর থেকে তিনি এলাবাসীর সহায়তায় করোনাভাইরাসের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক পরিচালনা করেন। তিনি দরিদ্রদের মধ্যে ৫০০টি মাস্ক বিতরণ,

লিফলেট বিতরণ, থ্রি-ডব্লিউ ক্যাম্পেইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ৩৫টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে তিনি বালাদেশ সরকারের গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হয়ে সাক্ষরতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তার এলাকাকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাহমিনা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। যেমন, তিনি জামালগঞ্জ উপজেলা মহিলা যুবলীগের সহ-সভাপতি, মহিলা পরিষদের সদস্য, সুনামগঞ্জ চেম্বার অব কমার্সের সদস্য এবং বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাহমিনা তার বড় মেয়েকে এমএ পাস করিয়েছেন এবং যোগ্য পাত্র দেখে তাকে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়েজামাই বালাগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিসে অফিস সহকারী কর্মরত রয়েছেন। আর তাহমিনার মেঝ ও ছোট মেয়ে সিলেটে বিএ অনার্সে অধ্যয়নরত।

স্বামীহারা তাহমিনা সাধারণ একজন নারী হিসেবে কঠিন লড়াই করে তিন মেয়েকে পড়ালেখা করিয়ে সুশিক্ষিত করেছেন এবং এলাকাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। যার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৯ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় ও ২০২১ সালে শিক্ষা ক্যাটাগরিতে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতায় হিসেবে স্বীকৃতি পান।

জয়িতা পুরস্কারের সনদ হাতে উজ্জীবক তাহমিনা বেগম

ভবিষ্যতে তাহমিনা বেগম তার জ্ঞান ও সমাজ উন্নয়নমূলক সুদীর্ঘ কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আরও বড় পরিসরে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে চান। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব নেয়, তাহলেই গড়ে ওঠবে আমাদের স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

সমাজের আপন মানুষ ফারজানা আক্তার মিলি

■ নেসার আমিন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪। এ দিন বাসে করে আগমনী বসন্তের এক সকালে রওয়ানা দিলাম রাজধানী ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জ শহরে। উদ্দেশ্য মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের এক অদম্য সমাজকর্মী, জনপ্রতিনিধি, উজ্জীবক ও নারীনেত্রী ফারজানা আক্তার মিলির সঙ্গে দেখা করা। ব্যস্ততার মধ্যেই শহরের উপজেলা পরিষদ ভবনের একটি কক্ষে আমাকে সময় দিলেন মিলি আপা। তার ব্যস্ততা নিজেকে নিয়ে নয়, এই ব্যস্ততা মানুষের জন্য।

সেদিন তিনি এসেছেন উপজেলা পরিষদের আমন্ত্রণে পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগ দিতে। যে সভায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-সহ উপজেলার ১৭টি বিভাগের কর্মকর্তা ও ১০টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভা শেষে আমার সঙ্গে আলাপচারিতায় যুক্ত হলেন তিনি। জানালেন তার জীবনজয়ের গল্প, যে গল্পের মানুষটা শুধু নিজের মানুষ নন, যে মানুষটা সমাজের মানুষ, গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের একান্ত আপন মানুষ।

মিলির জন্ম ১৯৮৫ সালের ৫ মে, মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি ইউনিয়নের ভুবেন্নেশ্বর গ্রামে। তার বাবা হেলাল উদ্দিন আহমেদ ছিলেন বিআরটিসির গাড়িচালক, যদিও এখন তিনি ব্যবসা করেন। আর মা তারানা বেগম ছিলেন গৃহিণী।

সমাজের আর দশজন মেয়ের মতো শুরু হয়নি মিলির জীবন। মিলি তার মায়ের পেটে থাকাবস্থায় তার বাবা আরেক বিয়ে করেন। মিলির ছোট মায়ের ঘরে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। মিলির বাবা তার মাকে শর্ত দেন যদি তার ছেলে হয়, তাহলে তিনি মিলির সঙ্গে সংসার করা অব্যাহত রাখবেন। কিন্তু মিলির জন্মের পর অনেকটা বাজি ধরার মতো হেরে যান মা। বাধ্য হয়ে মিলির জন্মের ৪৫ দিন পর সারাজীবনের জন্য মিলির মা তার স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হন। তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ না হলেও এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই।

শিশুসন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে এসে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করেন মিলির মা। মিলির মামা ছিলেন আট বোনের একমাত্র ভাই। তার একার পক্ষে এতবড় সংসার চালানো, বোনদের বিয়ে দেওয়া বিরাট কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মিলির মা স্বামীর বাড়ি থেকে ফিরে আসায় মামার বোঝা আরও বাড়ে। উপায় না দেখে মিলির মা পাশের বাড়িয়ে ঝিয়ের কাজ করতেন।

মিলির লেখাপড়া শুরু হয় গোয়ালডাঙ্গি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৯৭ সালে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন বুনিয়াজুরি উচ্চ বিদ্যালয়ে। অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন রাকিব আহমেদ জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ে। বাবা তার কোনো খোঁজ-খবর নিতেন না, শুধু এক ফুফু মাঝে মধ্যে দেখতে আসতেন।

২০০১ সালে দশম শ্রেণিতে পড়াবস্থায় মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাল্যবিবাহের শিকার হন মিলি। তার বিয়ে হয় মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দিঘী ইউনিয়নের চামটা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান সবেদ আলীর সঙ্গে। ২০০৩ সালে প্রথম কন্যা সায়মা আক্তার মীমের জন্ম হয়। এরপর ২০০৬ সালে দ্বিতীয় কন্যা লামিয়া আক্তার মুন্নীর মা হন মিলি। মিলি জানান, তার দু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বড় মেয়ে বিএ পাস করেছে, আর সংসারের দায়িত্বের চাপের কারণে ছোট মেয়ে এসএসসি পাসের পর আর লেখাপড়া করতে পারেনি।

মিলির স্বামী খুবই সহজ-সরল ভালো মানুষ ছিলেন। মিলি সংসারের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত হন। এরফলে সমাজের মানুষের কাছে তার পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।

হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে নারীনেত্রী ফারজানা আক্তার মিলি (বামে উপবিষ্ট)

২০১১ সালে আসে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। তিনি ১, ২ ও ৩নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত

মহিলা সদস্য পদে প্রার্থী হন। ২০১১ সালের শেষের দিকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পরিচালনায় রাজধানীর আদাবরে অবস্থিত পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (১০৬তম ব্যাচ) অংশ নেন। প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে তিনি জেন্ডার বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নেতৃত্ব দানের কৌশল রপ্ত করেন।

প্রশিক্ষণের পর বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে এলাকায় ফিরে আসেন। এলাকার নারীদের নিয়ে তিনি 'চামটা মহিলা গণগবেষণা সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির ২৬ জন সদস্য প্রতি সপ্তাহে ২০ টাকা করে সমিতিতে সঞ্চয় করেন। করোনার সময় সমিতির সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে।

চামটা-খাগড়াকুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎসাহী সদস্য হিসেবে মিলি ঝরেপড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়গামী করতে উঠান বৈঠক আয়োজন, মা দিবসে অভিভাবকদের নিয়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। তিনি নিজ উদ্যোগে অনেক শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন। বাল্যবিবাহের ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলার জন্য এবং নারীদের স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন মিলি। মিলি জানান, তার আয়োজিত উঠান বৈঠকে জেলা প্রশাসকও উপস্থিত ছিলেন।

মিলি নিজে বেশ কয়েকটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। এর মধ্যে একটি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার কারণে 'পল্লী সমাজ' থেকে তাকে নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারিও তৈরি হয়।

২০১৪ সালে সাভারের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন মিলি। প্রশিক্ষণটি তার জানার পরিধি আরও বৃদ্ধি করে, তাকে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী।

২০১৫ সালে মিলি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদে নির্বাচন করেন। ৩৩টি ভোটের মধ্যে ২৮টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করে তিনি ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে আবারও প্রার্থী হন এবং নির্বাচিত হন।

২০১৬ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে আয়োজিত স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ বিষয়ক এক কর্মশালায় যোগদানের সুযোগ পান। কর্মশালায় অংশ নিয়ে তিনি ইউপি সদস্য হিসেবে তার করণীয় সম্পর্কেও ভালোভাবে জেনে নেওয়ার সুযোগ পান। মিলি জানান, ইউপি সদস্য থাকাকালীন ওয়ার্ডসভা আয়োজন ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আয়োজনে ভূমিকা রাখেন তিনি।

২০১৮ সালে মিলি আবারও উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত সদস্য পদে নির্বাচন করেন এবং জয়লাভ করেন। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ২০১৫ সাল থেকে উপজেলা পরিষদের আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং রাস্তাঘাট-সহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে যুক্ত ছিলেন তিনি।

এছাড়া দীর্ঘ এগারো বছর তিনি 'পল্লী সমাজে'র ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া 'গ্রামীণ ব্যাংক' থেকে যথাযথ ব্যক্তি ঋণ পাচ্ছে কিনা তাও তদারকির দায়িত্ব হয় তাকে। 'আশা'র কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। সামাজিক কাজের অংশ হিসেবেই বিনা পারিশ্রমিকে তিনি এসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য মিলি নারীদের প্রশিক্ষণ পেতে সহযোগিতা করেন। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ, সেলাই, গবাদি পশু পালন ইত্যাদি। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহায়তায় নিজ বাড়িতেও কয়েকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন তিনি।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর সভার এক বিশেষ মুহূর্তে নারীনেত্রী ফারজানা আক্তার মিলি (বাম থেকে চতুর্থ)

মাদকের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার কণ্ঠের নাম মিলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তার এক সময়ের সহজ-সরল-ভালো স্বামীই এক পর্যায়ে মাদক ও জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। মিলি বহু চেষ্টা করেও তাকে মাদক ও জুয়া থেকে ফেরাতে পারেননি। ২০১৮ সালে স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য হন তিনি। পরে ঐ গ্রামেই মিলির দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় সংসারে আসিফ আহমেদ অন্তর নামে এক পুত্রসন্তান রয়েছে।

দরিদ্র ও অসহায় মানুষের উপকার করতে পারলে বিশেষ করে অসুস্থ রোগীকে ডাক্তারের নিয়ে যাওয়া ও তাদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে মিলি নিজের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করেন। মিলি জানান, জাহিদ মালিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাবস্থায়

মিলি স্বাস্থ্য বিষয়ক একদিনের প্রশিক্ষণ পান এবং স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এরফলে স্থানীয় ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো মিলিকে আলাদা করে চিনেন এবং তিনি কোনো রোগীকে নিয়ে গেলে গুরুত্ব সহকারে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে মিলি এখনও কাজ করেন।

মিলি ২০১০ সাল থেকে বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক-এর মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব করেছেন। ২০২৪ সালের ১ মার্চ তারিখ থেকে এই নেটওয়ার্ক-এর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য নারীনেত্রী ফারজানা আক্তার মিলি সালে জয়িতা পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে জানতে চাইলে ফারজানা আক্তার মিলি জানান, আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি মানুষের কল্যাণে আমৃত্যু কাজ করে যেতে চান এবং সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চান।

"কোনো দেশের অবস্থা দেশের নারীর জাতির অবস্থা হইতে প্রতীয়মান হয়।"
– পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

বহু গুণের দিপু এখন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা

নেসার আমিন

‘প্রবল অটল বিশ্বাস যার
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে,
যৌবন যার জীবনের ঢেউ
কলতরঙ্গে হাসে,
মরা মৃত্তিকা করে প্রাণায়িত
শষ্য কুসুমে ফলে।
কোনো বাধা তার রোধে নাকো পথ
কেবলি সম্মুখে চলে।’

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা উপরোক্ত কবিতার যেন বাস্তব প্রমাণ নারীনেত্রী রোখসানা পারভীন দিপু। প্রবল আত্মবিশ্বাস যে মানুষকে বদলে দিতে পারে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, উন্নয়নের উদাহরণ তৈরি করতে পারে, তিনি তার অন্যতম উদাহরণ।

দিপুর জন্ম ১৯৮৩ সালে, ভোলার দৌলতখান উপজেলার বড় ধলি গ্রামের এক সাধারণ পরিবারে। তার বাবা ছিলেন একটি বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কৃষিজমি এবং বাবার চাকরির আয় দিয়ে ভালোই চলছিল তাদের সংসার। বাবা-মা, ভাই-বোন ছাড়াও চাচা-চাচী ও দাদাকে নিয়ে ছিল তাদের যৌথ পরিবার। কিন্তু ১৯৮৮ সালে হঠাৎ করেই বাবার মৃত্যুর পর তাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। দিপুর মাতৃপক্ষ আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল ছিল না। বাবার মৃত্যুর পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে দিপুর দাদা তার মাকে বাড়ি থেকে একরকম তাড়িয়ে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে সন্তানদের রেখে বাবার বাড়ি ফিরে যান তার মা। দিপুর বড় ভাই কবির ভূঁঞা সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। দিপু-সহ পাঁচ ভাই-বোনের কাছে এই বড় ভাইটিই ছিলেন একমাত্র ভরসা। আর ক'দিন পরই লেখাপড়া শেষ করে সংসারের হাল ধরবেন– এমনটিই আশা ছিল সকলের। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস! মাত্র বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যেই আরেকটি দুর্ঘটনা কবিরের সম্ভাবনাময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। পিজি হাসপাতালের সামনে একটি গাড়ির ধাক্কায় নিভে যায় কবিরের জীবন প্রদীপ।

বাবা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর অনাথ চার ভাই-বোন ক্রমেই দিপুর দাদা ও চাচাদের কাছে বোঝা সমতুল্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত চাচা ও মামারা মিলে চার ভাই-বোনকে ভাগ করে

নেন। তবে শর্ত থাকে যে দাদার কাছে দিপুদের ভাগের যে সম্পত্তি আছে সন্তান লালন-পালনের জন্য তারা এগুলো ভোগ করবে। ছোটভাই-সহ দিপু যে চাচার ভাগে পড়লেন তিনি ঢাকার মানিকদি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বসবাস করতেন। চাচা ফয়েজ আহম্মেদ মানিকদি ক্যান্টনমেন্টে ওয়ারেন্ট অফিসার পদে চাকরি করতেন।

চাচা-চাচীর আশ্রয়ে এসে দিপু ও তার ছোট ভাই নতুন এক নির্মমতার মুখোমুখি হন। চাচার বাড়ি থেকে কাজের লোকদের বিদায় করে দেওয়া হয়। ফলে বাড়ির যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব বর্তায় অনাথ এই শিশু দুটির ওপর। এভাবে দুই বছর কেটে যায়। লেখাপড়ার পরিবর্তে একরকম গৃহভৃত্যের কাজ করতে থাকে বাবা-মা হারা এই দুই ভাই-বোন।

১৯৯১ সালে দিপুর বড় বোন ঢাকায় এসে ছোট ভাই-বোনের এই দূরবস্থার কারণ সম্পর্কে চাচাকে প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত দিপুর চাচা দিপুকে মানিকদি আদর্শ বিদ্যা নিকেতনে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। স্কুলে ভর্তি হলেও বাসায় লেখাপড়ার সুযোগ দিপু কোনো সময়ই পেত না। সংসারের বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়েই তাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হত।

প্রশিক্ষকের ভূমিকায় নারীনেত্রী রোখসানা পারভীন দিপু

১৯৯১ সালে রমজান মাসের এক রাতে খাবার ভাত কম হওয়ায় দিপুর ছোট ভাই কান্না শুরু করে এবং না খেয়েই রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সকালে ক্ষুধার জ্বালায় সে পুনরায় কান্না শুরু করলেও চাচী তার জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা করেননি। দুপুর বারোটার দিকে চাচী খাবারের জন্য ছোট এই বাচ্চাটিকে গোসল করে আসতে বলে। শুধু একমুঠো খাবারের আশায় অভুক্ত শিশুটি বাড়ির পাশের ঝিলে গোসল করতে যায়। দিপু জানত তার চাচী হয়ত তাকে সারাদিন খাবার দেবে না। তাই সে তার ভাগের ভোরের খাবারটুকু পানি দিয়ে পান্তা করে রেখেছিল দুপুরে ছোটভাইকে খেতে দেওয়ার জন্য। চাচীর মাধ্যমে জানার পর দিপু তার হাতের কাজ শেষ করে ছোট ভাইয়ের জন্য খাবাব নিয়ে অপেক্ষা করছিল। গোসল শেষে ছোট ভাই ফিরে এলেই তাকে খাবারটুকু দিয়ে তার কান্না থামাবে। কিন্তু মিনিটের পর ঘণ্টা পার হয়ে যায়, ছোট ভাই বাহার আর আসে না। প্রায় দু ঘণ্টা পর বাড়ির কাজ শেষে দিপু ছোট ভাইয়ের খোঁজে ঝিলের দিকে যেতেই দেখেন তার চাচা কোলে করে ছোট ভাইয়ের লাশ নিয়ে আসছে। চাচা জানালেন সে পানিতে ডুবে মারা গেছে। দিপুর আজও মনে হয়, বাহার তখনো বেঁচে ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করালে হয়তো বাহার বেঁচে যেত।

সময় এগিয়ে চলে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও চাচীকে সন্তুষ্ট করা ছিল দিপুর জন্য দুরূহ কাজ। লেখাপড়ার জন্য সময় পেতেন। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতেন না তিনি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি দিপুর আগ্রহ দেখে স্কুলের শিক্ষকরা দিপুকে অনেক সহযোগিতা করেন। এমনকি দিপুর লেখাপড়া যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য তারা দিপুর চাচা-চাচীর সঙ্গে দেখাও করেন। এসকল প্রতিকূলতার মধ্যেও দিপু পরীক্ষায় সবসময় ভালো ফলাফল করতেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পান দিপু। ১৯৯৭ সালে দিপু মানিকদি আদর্শ বিদ্যা নিকেতন থেকে স্টার মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন।

এসএসসি পরীক্ষার শেষ দিনটি ছিল দিপুর জীবনের আরও একটি বেদনার দিন। সেদিন পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে দেখেন চাচা-চাচী তার বিয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকে দ্রুত প্রস্তুত হতে বলা হয়, কারণ বরপক্ষ চলে আসবে। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পরও দিপুর কথা কেউ শোনেনি। সন্ধ্যা নামার আগেই কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই বিয়ে হয়ে যায় তার। বিয়ের পর তিনি জানতে পারেন, স্বামী একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করে। বিয়ে করেই তিনি দিপুকে নিয়ে চলে আসেন ঢাকার মিরপুরের ভাড়া বাসাতে। এখানে শুরু হয় দিপুর নতুন জীবনের আরেক অধ্যায়।

দিপু বসে থাকার মানুষ নন। ঘরে অলস বসে না তিনি ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়নের হস্তশিল্প বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে তার দক্ষতা দেখে যুব উন্নয়নের কর্মকর্তাগণ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে তাদের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেয়। এরপর যুব উন্নয়নের পক্ষ থেকে দিপু ব্যাচের পর ব্যাচ প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দিপুর হাতে বেশকিছু অর্থ জমা হয়। স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি মিরপুর বাংলা কলেজে ভর্তি হন এবং ২০০০ সালে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন।

লেখাপড়া ও যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে দিপুর সঙ্গে অনেকের পরিচয় ঘটে। মিলি যাকারিয়া এদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিপুর সকল ঘটনা জানতেন এবং সাধ্যমত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতেন। মিলি যাকারিয়া দিপুকে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। দিপু সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ২০০০ সালে ১২৫তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দিপু অনেক অজানা বিষয় জানতে পারেন, তার মধ্যে তৈরি হয় আত্মবিশ্বাস।

এর পরের গল্প শুধুই দিপুর সফলতা ও সামনের দিকে এগিয়ে চলার গল্প। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি আগের কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে ২০০২ সালে স্নাতক এবং ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে আরেকটি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এখানেই শেষ নয় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দিপু হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ও মার্কেটিংয়ের ওপর দুটি এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং এলএলবি ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন।

নারীদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে দিপু ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রতিবেশী কুটির শিল্প' নামক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে বর্তমানে স্বল্প খরচে রান্না, সেলাই, পার্লার, ব্লক-বাটিক, গিফট আইটেম-সহ ২৫০টি বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদ দেওয়া হয়। এখানে কোনো একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হলে পরবর্তীতে ওই বিষয়ে কোর্সটি পুনরায় বিনা খরচে দেখার সুযোগ পান প্রশিক্ষণার্থীরা। এখান থেকে উৎপাদিত পণ্যসমূহ দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও বিশেষ করে ফ্রান্স ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন নারীনেত্রী রোখসানা পারভীন দিপু

দিপু তার 'প্রতিবেশী কুটির শিল্প'-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রায় ত্রিশ হাজারেরও অধিক নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অনেকেই এই প্রশিক্ষণকে কাজে লাগিয়ে আজ স্বাবলম্বী হয়েছেন। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে এখনও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

এসকল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালের পহেলা নভেম্বর ওসমানী মিলনায়তনে দিপুকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করে। শুধু তাই নয়, একই বছরের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে 'হিউম্যান রাইটস সোসাইটি' প্রশিক্ষণে পারদর্শিতা ও ত্রিশ হাজার নারীকে কর্মময় করে তোলার জন্য তাকে স্বর্ণপদক প্রদান করে।

পরবর্তীতে কাজের পরিধি বাড়ে দিপুর, সঙ্গে মেলে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। ইতিমধ্যে তিনি চারবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ-এর কাছ থেকে দুইবার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে একবার পুরস্কার গ্রহণ করেন। তার প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০১৭, সংগঠক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার-২০১৭, ভলান্টিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড-২০২০, আত্মকর্ম সৃষ্টি ও সমাজসেবায় অবদান রাখার জন্য শ্রেষ্ঠ জয়িতা-২০২০, বিভাগীয় পর্যায়ে জয়িতা-২০২২, শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার, ইত্যাদি। দিপু নিজেও তার 'প্রতিবেশী কুটির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে সেরা উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ এসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি থাকেন।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে মিরপুরের ৬নং সেকশনের ‘ট’ ব্লকে দিপু আরও দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে আড়াই কাঠা জায়গা কিনে কোনো ঋণ ছাড়াই একটি ছয়তলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এ বাড়িতে থাকার পাশাপাশি তিনি ‘প্রতিবেশী কুটির’ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। ২০১৩ সালে এনজিও ব্যুরো থেকে ‘প্রতিবেশী কুটির’-এর নিবন্ধন নিয়েছেন। এর পাশাপাশি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বিসিক থেকে এর নিবন্ধন নেওয়া হয়েছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাজের ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়। দিপু ২৭টি এনজিও’র সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এটা সম্ভব হয়।

২০২১ সালে প্রতিবেশী সেরা উদ্যোক্তা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে নারীনেত্রী রোখসানা পারভীন দিপু

দিপু মিরপুরে স্কিন প্রিন্টের একটি কারখানা দিয়েছেন। এই কারখানায় ৪১ জন নারী কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া শিয়ালবাড়ি মোড়ে একটি বিউটি পার্লার, মিরপুর-১০ এ ফুড কর্নার, মিরপুর-২ এ মিরপুর শপিং কমপ্লেক্সের তিনতলায় একটি বুটিক শপ রয়েছে তার।

দিপু প্রতিদিন নয়টা থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পিডি লাইট কোং, এসএমই ফাউন্ডেশন, তরঙ্গ, পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, বিআরডিপি ও ওয়ার্ল্ড ভিশনে খণ্ডকালীন প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি প্রতিমাসে ৩৫ হাজার টাকা সম্মানী পান। এর পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে দুইদিন ব্যবহারিক ক্লাস নেন। আর প্রতিদিন বিকাল তিনটা থেকে তিনি ক্লাস নেন তার নিজের প্রতিষ্ঠিত ‘প্রতিবেশী কুটির’ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এখান থেকে সেরা দশজন প্রশিক্ষণার্থীকে পরে প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলেন দিপু এবং নতুন উদ্যোক্তাদের গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন পেতে সহায়তা করেন তিনি। কুটির শিল্পের কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে তিনি কোরিয়া, চীন ও ফিনল্যান্ড-সহ ২৭টি দেশ ভ্রমণ

করেছেন।

কাজের জন্য বাইরে বের হতে গেলের দিপুর সঙ্গী হয় তার স্কুটি। কারণ এতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব। প্রতিবেশী কুটির থেকে প্রতি শুক্রবার তিনি নারীদের স্কুটি চালনা শিক্ষা দেন। এখন পর্যন্ত একশ'র বেশি নারীকে স্কুটি চালনা শিখিয়েছেন তিনি।

ভাতের অভাবে নিজ ভাইয়ের করুণ মৃত্যু দিপুকে এখনো কাঁদায় দিপুকে। এজন্য তিনি অনাথ শিশুদের কল্যাণে সাভারে সাড়ে আট কাঠা জায়গায় তিনতলাবিশিষ্ট একটি এতিমখানা নির্মাণ করেছেন। এর নিচতলা হবে মার্কেট। মার্কেটের অর্থ দিয়ে পরিচালিত হবে এতিমাখানা, তৃতীয় তলায় হবে বৃদ্ধাশ্রম। এতিমখানার নাম দিয়েছেন 'রোকসানা-বাহার এতিমখানা'। তিনি এই এতিমখানা পরিচালনার জন্য তিনি কোনো সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য নিবেন না– এটাই পণ দিপুর।

দিপুর সামাজিক কাজের মধ্যে অন্যতম হলো বৃক্ষরোপণ। মিরপুর এলাকার বিভিন্ন সড়কে প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করেছেন তিনি। এছাড়া করোনার সময় মাস্ক বিতরণ-সহ মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন তিনি।

যে মানুষগুলো, যে আত্মীয়-স্বজনেরা একসময় দিপুকে অবহেলা করেছে, আজ প্রয়োজনে সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান দিপু। তাদেরকে অনেককে নগদ অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে

বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা (বামে) এবং দরিদ্র মানুষের মাঝে
মাস্ক বিতরণ করছেন নারীনেত্রী রোখসানা পারভীন দিপু

অকালে বাবা ও বড় ভাইকে হারিয়ে যে রোখসানা পারভীন দিপু একদিন করুণার পাত্রী হয়ে চাচা-চাচীর কাছে বড় হয়েছিলেন, সেই দিপু এখন বহু গুণে গুণান্বিতা উচ্চশিক্ষিত এক নারী, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও প্রশিক্ষক। 'আমরা নারী, আমরাও পারি,'– এই স্লোগান তথা

“পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি-ব্যারিস্টার, লেডি জজ– সবই হইব।

উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা ‘স্বামী’র গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?”

‘স্ত্রীজাতির অবনতি’
– বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন